فَتَاوِى ثَلَاثِين

ফতোয়ায়ে ছালাছীন
বা
ত্রিশ ফতোয়া

অধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল
(এম এম, এম এ, বিসিএস)

ফতোয়ায়ে ছালাছীন বা ত্রিশ ফতোয়া ★ অধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল

فتاوى ثلاثين

ফতোয়ায়ে ছালাছীন

বা

ত্রিশ ফতোয়া

গ্রন্থকার ঃ

অধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল জলিল

এমএম, এমএ, বিসিএস

গ্রাম ঃ আমিয়াপুর, ডাকঘর ঃ পাঠান বাজার

থানা ঃ মতলব (উত্তর), জিলা ঃ চাঁদপুর।

উৎসর্গ

ওলিকুল সম্রাট গাউসুল আ'যম বড়পীর হযরত ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহু আনহু এবং সুলতানুল হিন্দ আতায়ে রাসুল হযরত ছৈয়দ খাজা মুঈন উদ্দিন চিশ্‌তী ছুম্মা আজমিরী রাদিআল্লাহু আনহু-এর পাক দরবারে, "ফতোয়ায়ে ছালাছীন" গ্রন্থখানি কবুলিয়তের জন্য উৎসর্গ করা হ'ল।

বিনীত খাকছার

মুহাম্মাদ আবদুল জলিল

এমএম, এমএ, বিসিএস

ফতোয়ায়ে ছালাছীন

গ্রন্থকার ঃ অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর - ২০০৩ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করনঃ ৩১ আগস্ট, ২০০৯ ইংরেজী

০৯ ই রমজান, ১৪৩০ হিজরী

১৬ ই ভাদ্র, ১৪১৬ বাংলা

প্রকাশকঃ আমিনা খাতুন

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটারঃ এম. এ. এইচ. মাসুম

মুদ্রণেঃ সূচনা প্রিন্টিং এন্ড এডভার্টাইজিং

৮৫/১, (চতুর্থ তলা), পুরানা পল্টন লেন, পল্টন, ঢাকা।

মোবাইলঃ ০১৮১৯৫৩৬৩০৬,

পরিবেশনায়

উজ্জীবন লাইব্রেরী

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। মোবাইলঃ ০১৮১৫৪১০২৬২

প্রাপ্তি স্থানঃ

উজ্জীবন লাইব্রেরী

১.কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া (কামিল) মাদরাসা,

জয়েন্ট কোয়ার্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ।

২. ৩/৯ জয়েন্ট কোয়ার্টার, মাদ্রা-া রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

৩. গাউছুল আজম জামে মসজিদ, উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা

৪. মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা, আন্দরকিল্লাহ, চট্টগ্রাম।

৫. জাগরন ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স,১৫৫, আনজুমান মার্কেট, আন্দরকিল্লাহ, চট্টগ্রাম।

হাদিয়াঃ সাদা-৮০ টাকা, পাউন্ড-৬.০০

"AHKAMUL MAZAR" Written by Principal Hafiz Maolana Mohammad Abdul Jalil, Formar Director: Islamic Foundation Bangladesh, Secretary General. Ahle Sunnat wal Jamaat, Bangladesh & Published by Mrs. Amina Khatun

Price: Taka: 80.00 £ 6.00

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১। মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়ার দলীল-	৫
০২। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মানত করা, পশু ছেড়ে দেয়া বা যবেহ করার দলীল-	৫
০৩। মৃত ব্যক্তিদের রূহানী কর্তৃত্বের দলীল-	৬
০৪। মাযারবাসীর কাছে রূহানী সাহায্য চাওয়ার দলীল-	৭
০৫। কোন অনুষ্ঠানে ওলী-আল্লাহদের রূহানী উপস্থিতির দলীল-	৮
০৬। নবী-ওলীগণের আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েবের দলীল-	৯
০৭। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অন্য কেউ কিছু দিতে পারার দলীল-	১০
০৮। মৃত ব্যক্তিকে উছিলা বানিয়ে দোয়া করার দলীল-	১১
০৯। কবরকে কেন্দ্র করে উরস করার দলীল-	১৪
১০। মাযারে গিয়ে বাচ্চার চল্লিশা করা, চুল কামানো ও শিরনী দেয়ার দলীল	১৭
১১। মাযারে বাতি দেওয়া ও সিজদা করার প্রসঙ্গ-	২০
১২। কবরে ফুল দেওয়া, কবরবাসীর নিকট সন্তান ও টাকা পয়সা চাওয়া এবং কবর প্রদক্ষিণ করার দলীল-	২৪
১৩। মাযারে উরস উপলক্ষে ঢোল তবলা বাজানো, মাযারে চাদর দেওয়া প্রসঙ্গে-	২৮
১৪। কবরে বাতি জ্বালানো, কবর সিজদা করা, মেয়েলোকের কবর যিয়ারত, মাযারে গম্বুজ ও কোববা নির্মান করা প্রসঙ্গে-	৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১৫। কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করার দলীল-	৪৭
১৬। প্রচলিত মিলাদ মাহফিল জায়েযের দলীল-	৫০
১৭। শবে-বরাতের হালুয়া-রুটী জায়েযের দলীল-	৫৪
১৮-১৯। রোগ বা বিপদ থেকে মুক্তির জন্য হাতে সুতা তাগা বাধা, কোরআনের আয়াত দ্বারা তাবিজ তুমার বাধার দলীল-	৫৫
২০। প্রচলিত কদমবুচি (পদচুম্বনের) দলীল-	৫৮
২১। বর-কনের গায়ে হলুদ দেয়ার প্রথা প্রসঙ্গে-	৬০
২২। চেহ্লাম বা চল্লিশা করার দলীল-	৬০
২৩। তাযিমী সিজদা শির্ক না হওয়ার দলীল– তবে কবিরা গুনাহ্-	৬২
২৪। ইস্তিনজার সময় কাশাকাশি, গলা ঝাড়া দোয়া প্রসঙ্গে-	৬৬
২৫। উচ্চৈঃস্বরে যিকির করার দলীল-	৬৭
২৬। ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) পালনের দলীল-	৭১
২৭। জন্ম দিবস পালন করার দলীল-	৭৬
২৮। শবে-বরাত সম্পর্কে খতীব ওবায়দুল হক্বের মন্তব্য রদ-	৭৮
২৯। শবে-বরাত সম্পর্কে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মন্তব্যের রদ-	৭৯
৩০। গাউসুল আযম, মুশকিল কুশা, গরীব নওয়াজ ও কাইউমে জামান উপাধী সম্পর্কে আবদুল কাহহারের কটূক্তির জবাব-	৮২

فَتَاوٰی ثَلَاثِیْن

ফতোয়ায়ে ছালাছীন

বা

ত্রিশ ফতোয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী আলা রাছুলিহিল কারীম

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ـ

প্রশ্ন- ১ঃ মাসিক মদিনা মার্চ ২০০৩ সংখ্যায় ৩৯-৪০ পৃষ্ঠায় জনৈক আবদুল্লাহ ইবনে সামছ ২৭টি আক্বিদা ও আমলকে বিদআত, শিরক ও কুফরী বলে দাবী করেছে। কিন্তু কোন দলীল উল্লেখ করেনি। কোন কোনটির ক্ষেত্রে শুধু পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছে। তন্মধ্যে ১নং দাবী হচ্ছে- *"কোন মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক"* । তার দাবী কতটুকু সত্য?

ফতোয়া ঃ তার দাবী মোটেই সত্য নয়– বিবিধ কারণে। প্রথমতঃ সে কোন দলীল পেশ করেনি। দ্বিতীয়তঃ সে সকল মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে একই মন্তব্য করেছে। নবী ও অলীগণের নিকট রুহানী সাহায্য চাওয়া হাদীস ও ইমাম মুজতাহিদগণের কিতাব দ্বারা সুপ্রমানিত। যেমন- হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে-

(ক) اِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِى الْاُمُوْرِ فَاسْتَعِيْنُوْا بِاَهْلِ الْقَابِرِ ـ

অর্থাৎ- "যখন তোমরা কোন ব্যাপারে সঙ্কটে পড়ে যাও- তখন কবরবাসীদের মাধ্যমে সাহায্য চাও"। (দেখুন আবদুল হাই লক্ষৌভীর মজমুউল ফাতাওয়া ও আল্লামা দাজুভী সাহারানপুরীর আল বাছায়ের)।

(খ) ইমাম গাযযালী (রহঃ) ইহ্ইয়াউল উলুমে লিখেছেন-

مَنْ يُسْتَمَدُّ بِهٖ فِىْ حَيَاتِهٖ يُسْتَمَدُّ بِهٖ بَعْدَ وَفَاتِهٖ ـ

অর্থাৎ- "যার কাছে জীবিতাবস্থায় সাহায্য চাওয়া বৈধ, ইনতিকালের পরেও তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েয" ।

প্রশ্ন- ২ঃ ইবনে সামছ ২নং দাবী করেছে- *"আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে*

মানত করা, পশু ছেড়ে দেয়া বা পশু যবেহ্ করা কুফরী"। ইহা সঠিক কি না?

ফতোয়া ঃ তার দাবী মোটেই সঠিক নয়। কেননা, দলীল বিহীন কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

দলীল ঃ

(ক) শাহ্ রফিউদ্দীন দেহলভী ইবনে শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী তাঁর "নযর ও মাযার" গ্রন্থে লিখেছেন- "কোন অলীর নামে মানত করা নযরে উরফী- যাকে নেয়ায বলা হয়- তা শরিয়ত মোতাবেক জায়েয"।

(খ) তাফসীরাতে আহমদী"তে মোল্লা জিউন (রহঃ) লিখেন-

اَلنَّذْرُ لِغَيْرِاللّٰهِ حَرَامٌ وَنَذْرُالْاَوْلِيَاءِ مُؤَوَّلٌ بِاَنَّ النَّذْرَلِلّٰهِ وَثَوَابُهُ لَهُمْ -

অর্থাৎ- আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে শরয়ী নযর বা শরয়ী মানত করা হারাম। কিন্তু অলী আল্লাহ্গণের নামে মানত করার অর্থ হলো এই- "মানত আল্লাহ্র জন্য কিন্তু তার সাওয়াব হলো অলীগণের জন্য"। ইহাকে উরফী নযর বলা হয়।

(গ) ইহা ছাড়াও ইসমাঈল দেহলভী- যিনি দেওবন্দীদের মাথার মুকুট ও ভারতে ওহাবী মতবাদ আমদানীকারক- তিনি তার "তাকরীরে যাবায়েহ্" গ্রন্থে ফার্সি ভাষায় লিখেছেন- যা নিম্নরূপ-

"اگر گاؤ زنده بنام سید احمد کبیر را بدہد بطوریکه نقد میدهند نیز رواست وگوشت ان حلال"

"যদি কোন ব্যক্তি মানত করে যে, আমার অমুখ মকসুদ হাসিল হলে আমি সৈয়দ আহমদ কবির (রহঃ) -এর জন্য একটি জীবিত গরু দেবো- তাহলে তা দুরস্ত হবে" (তাকরীরে যাবায়েহ্ কৃত ইসমাঈল দেহলভী)। আরও বহু দলীল আছে। কোন অলীর নামে মানত করা পশু ছেড়ে দেয়া কুফরী তো দূরের কথা- মাকরূহ্ও নয়।

প্রশ্ন- ৩ ঃ ইবনে সামছ ৩নং দাবী করেছে- *"মৃত লোকেরা দুনিয়ার ব্যাপারে তাসাররুফ করে (নিজের ইচ্ছামত কোন কাজ করতে পারে বা কোন ঘটনা*

ঘটাতে পারে) বলে বিশ্বাস করা কুফরী"। তার দাবী সঠিক কিনা?

ফতোয়া ঃ তার দাবীটি ভুলে ভরা। সে বন্ধনীর মধ্যে "নিজের ইচ্ছামত ......" শব্দগুলো জুড়ে দিয়ে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। আল্লাহ্‌র অলীগণ জীবিত বা কবরে থেকেও আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অনেক ঘটনা ঘটাতে পারেন। এর অসংখ্য বাস্তব প্রমান রয়েছে। যেমন, সোলায়মান আলাইহিস সালামের উম্মত আসিফ বিন বরখিয়া এক মুহূর্তে চোখের পলকে সুদূর ইয়েমেনের সাবা নগরী থেকে রানী বিলকিসের সিংহাসন সোলায়মান আলাইহিস সালামের দরবারে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন বলে স্বয়ং কোরআন মজিদে উল্লেখ আছে। তিনি বলেছিলেন- "হে সোলায়মান (আঃ)! আমি রানীর সিংহাসনকে আপনার চোখের পলক মারার আগেই এনে দিব" (সূরা নমল)। এটা ছিল আসিফ বিন বরখিয়ার খোদা প্রদত্ত তাসাররুফ ক্ষমতা। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) আবুল মাআলী নামক জনৈক সওদাগরকে পায়খানা করার জন্য চোখের পলকে ১৪ দিনের রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন (দেখুন বাহজাতুল আসরার)। মাসিক মদিনার উক্ত প্রবন্ধ লেখক ইবনে সামছ যেই তাসারুফকে কুফরী বলেছেন- আল্লাহ্ পাক তাহাই বাস্তবায়ন করে অলী বিদ্বেষীদের গালে চপেটাঘাত মেরেছেন। আল্লাহ্ কি তাঁদেরকে ক্ষমতা দিয়ে কুফরী করেছিলেন? অথবা আসিফ বিন বরখিয়া ও বড়পীর সাহেব কি নিজেদের ক্ষমতা বলে এরূপ করেছেন বলে দাবী করেছেন? কখনই না। বাতিল পন্থীদের চক্ষু কতই না অন্ধ। গাউছে পাক (রাঃ) বলেছেন-

مَنْ تَوَسَّلَ بِيْ اِلَى اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ قُضِيَتْ-

অর্থ- "যে কেউ আমার উছিলা দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাইবে- তা পূরণ হবে"। তিনির ইনতিকালের পরেও এই উক্তি প্রযোজ্য।

প্রশ্ন- ৪ ঃ ইবনে সামছ ৪নং দাবী করেছে- *"মাযারবাসীর কাছে সাহায্য প্রার্থী হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শিরক"।* ইহা কতদূর সত্য?

ফতোয়া ঃ তার দাবী নিতান্তই অমূলক। সে দলীল বিহীন শির্‌ক দাবী করেছে- এটা তার জঘন্য অপরাধ। কোন বিষয়ে শির্‌ক, হারাম, নাজায়েয- এমনকি মাকরূহ্ দাবী করার জন্যও দলীল পেশ করা শর্ত। সে কিছুই করেনি। "মাযারবাসী" বলতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং

অলীগণকেও বুঝায়। নবীজী এবং অলীগণের নিকট সাহায্য প্রার্থী হওয়ার অসংখ্য দলীল মওজুদ আছে। যেমন-

(ক) শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) তাঁর জযবুল কুলুবে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা হলো- তিনজন বড় অলী-আল্লাহ্ মদিনা শরীফের রওযা মোবারকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে সালাম আরয করে বললেন- "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা তিনদিন যাবত বড় ক্ষুধার্ত। এক্ষন আমরা আপনার মেহমান হলাম"। একথা বলেই তাঁরা অবশ দেহে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খান্দানের জনৈক আহলে বাইত মাথায় করে রুটী ও গোশত নিয়ে হাযির। তিনি তিনজন অলীকে সজাগ করে বললেন- আপনারা কি হুযুরের কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন? তাঁরা বললেন- হাঁ। উক্ত সৈয়দ সাহেব বললেন- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে আমাকে নির্দেশ করেছেন যেন তাড়াতাড়ি হুযুরের পক্ষে আপনাদের মেহমানদারী করি" (জযবুল কুলুব)।

–এবার ইবনে সামছ ইহার জবাব দিন। উক্ত অলীগণ কি সাহায্য চেয়ে কুফরী করেছেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহায্য করে কি কুফরী সমর্থন করেছিলেন? নাউযুবিল্লাহ!

প্রশ্ন- ৫ ঃ ইবনে সামছ ৫নং দাবীতে বলেছে- *"কোন অনুষ্ঠানে মাশায়িখ বা পীর অলীগণের রূহ হাযির হয় বলে বিশ্বাস করা কুফরী"*। তার কথা সঠিক কিনা?

ফতোয়া ঃ তার এই কথা দলীলবিহীন দাবী। তাই শরিয়ত মোতাবেক অগ্রাহ্য। কুফরী প্রমাণ করতে হলে অখণ্ডনীয় দলীলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে দলীল পেশ করেনি।

দলীল ঃ

(ক) পীর, মাশায়েখ ও পবিত্র রূহ সম্পর্কে মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত গ্রন্থে এবং আল্লামা মানাভী তাঁর তাইছির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

اِذَا تَجَرَّدَتِ النُّفُوْسُ الْقُدْسِيَّةُ مِنَ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ
اِتَّصَلَتْ اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى فَتَسِيْرُ فِيْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضِ حَيْثُ تَشَاءُ وَتَرَى وَتَسْمَعُ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ-

অর্থাৎ- "পবিত্র আত্মাসমূহ (অলী আল্লাহ) যখন শারিরীক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়- তখন উর্দ্ধজগতের ফিরিস্তাদের সাথে মিলিত হয়ে আসমান জমীনের যে কোন প্রান্তে ইচ্ছানুযায়ী ভ্রমণ করে থাকেন এবং জীবিত লোকদের ন্যায় সব কিছু দেখেন এবং শুনেন"।

লোকটিকে মনে হয় জাহেল। আলেম হলে এমন কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে পারতোনা।

প্রশ্ন- ৬ ঃ ইবনে সামছ ৬নং- এ আরোও দাবী করেছে- *"আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে বলে বিশ্বাস করা শির্ক। নবী করীম (দঃ) গায়েব জানতেন- এরূপ ধারনা পোষণকারী কাফির- কোন পীর অলী তো দূরের কথা"*। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- সে কোন্ খুঁটার জোরে এমন কথা বলছে- জানাবেন কি?

ফতোয়া ঃ অবশ্যই জানাবো। তার উক্তির ধরনে বুঝা যাচ্ছে যে, সে একজন নিরেট মূর্খ। সে তার গুরুজনদের কাছে শুনে এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ব উক্তি করতে সাহসী হয়েছে। নবীজীর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব এমন একটি বিষয়- যার উপর শত শত কিতাব লিখা হয়েছে। কাজী আয়ায (রহঃ) তাঁর "কিতাবুশ শিফা" গ্রন্থে বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে নবীজীর ইলমে গায়েব প্রমাণ করেছেন। জমীনের গায়েবী জিনিস, আসমানের গায়েবী জিনিস, বেহেস্ত দোজখের গায়েবী জিনিস, অন্তরের গোপন খেয়াল- ইত্যাদি বিষয়ে নবীজীর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েব কোরআন সুন্নাহ্ ও ইজমা কিয়াসের দ্বারা সু প্রমাণিত।

প্রমান স্বরূপ ঃ (ক) হযরত আব্বাস (রাঃ) অনিচ্ছা সত্বেও কোরায়েশদের সাথে বদরের যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হন। তিনি উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে ধৃত হয়ে মদিনায় নীত হন। তাঁর মুক্তির ব্যাপারে নবীজী বিশ উকিয়া মুক্তিপন ধার্য করেন। তাঁর সাথে তাঁর বংশের আরো তিনজনের মুক্তিপন ধার্য্য করেন ষাইট উকিয়া। (এক উকিয়া ৫০০ টাকার সমান)। সর্বমোট আশি উকিয়া বা চল্লিশ হাজার টাকা একা হযরত আব্বাসের উপর ধার্য করায় তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেন- যেখানে আমার নিজের মুক্তিপন আদায় করার সাধ্য নেই- সেখানে আরো তিনজনের মুক্তিপন কোথা থেকে দেবো? তদুত্তরে নবীজী বললেন- "আপনি

আসার সময় রাত্রের অন্ধকারে আমার চাচী উম্মুল ফযলের নিকট যে আশি উকিয়া রেখে এসেছিলেন- আমি তাই ধার্য করেছি- এর বেশী নয়"। এই গায়েবী সংবাদ শুনে হযরত আব্বাস (রাঃ) তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)

(খ) আল্লাহ্ পাক কোরআন মজিদে এরশাদ করেন-

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ -

অর্থাৎ- "হে রাসুল! আপনার রব আপনাকে আপনার অজানা সব কিছু শিক্ষা দিয়েছেন"। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সাভী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন- - مِنَ الْاَحْكَامِ وَالْغَيْبِ অর্থাৎ- "শরিয়তের যাবতীয় বিধি বিধান এবং যাবতীয় বিষয়ের ইল্‌মে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন"। নবীজীর খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়েবের বিষয়ে এরূপ হাজারো প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং, চোখ থেকে যে অন্ধ সাজে- তাকে পথ দেখানো খুবই কঠিন ব্যাপার। আল্লাহ্ হেদায়াত নসীব করুন। ইল্‌মে গায়েবের এত অকাট্য দলীলকে যে অস্বীকার করে সে-ই কাফের- অন্য কেউ নয়। অলী-আল্লাহ্গণও কাশ্‌ফের মাধ্যমে অনেক গায়েব বলতে পারেন। এর অসংখ্য নযির রয়েছে। ইবনে সামছের দেওবন্দী মুরুব্বিরাও কাশ্‌ফ দাবী করেছে।

প্রশ্ন- ৭ঃ ইবনে সামছ ৭নং- এ আরো দাবী করেছে- *"যেসকল বস্তু আল্লাহ্ ছাড়া কারো দেয়ার ক্ষমতা নেই- এমন বস্তু কেউ দিতে পারে বলে বিশ্বাস রাখা বা কারো কাছে তা চাওয়া কুফরী"*। তার দাবী কি সত্য?

ফতোয়া ঃ মোটেই সত্য নয়। এমন কোন্ বস্তু আছে- যা আল্লাহ্ ছাড়া কারো দেয়ার ক্ষমতা নেই- ইবনে সামছ তা উল্লেখ করেনি। তাই, তার কথা অস্পষ্ট- যা আইনের দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য। ধরুন- বেহেস্ত দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ্র। ধনী বানানোর ক্ষমতাও আল্লাহর। এ দুটি জিনিসও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিতে পারেন বলে কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন-

(ক) হুযুরের খাদেম হযরত রাবিয়াহ্ ইবনে কাব (রাঃ) কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বললেন- سَلْ مَا شِئْتَ "তোমার যা মনে চায়, আমার কাছে প্রার্থনা করো"। হযরত রাবিয়াহ্ ইবনে কা'ব (রাঃ) আরয

করলেন- أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ -

অর্থাৎ- "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে চাই"। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মঞ্জুর করেছিলেন। (মিশকাত)

(খ) শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আশিয়াতুল লুমুয়াতে বলেন- (অনুবাদ) "উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আসমান জমীন ও জান্নাতের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আল্লাহ্ পাক নবীজীকে দান করেছেন"। (আশিয়াতুল লুমআত)।

(গ) কোরআন মজিদে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন- أَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ

অর্থাৎ- "মদিনাবাসীদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধনী বানিয়েছেন" (সূরা তওবা)।

(ঘ) আর একটি বিষয় ধরা যাক- তাক্বদীর পরিবর্তন করা একান্তভাবেই আল্লাহ্র আয়ত্বাধীন। এমন একটি বিষয়ের ক্ষমতাও তিনি হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-কে দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহঃ) তাঁর মকতুবাত শরীফে বলেন- (যার বাংলা অনুবাদ করেছেন শর্ষিনার কায়েদ সাহেব মাওলানা আজিজুর রহমান এবং ১৯৭৫ ইং সালের "তাবলীগ" মাসিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে)

"আল্লাহ্র এলেমে এমন কিছু তাক্বদীর আছে- যা কোন কারণে পরিবর্তন হতে পারে। এমন তাক্বদীর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার অলৌকিক ক্ষমতা আল্লাহ্ পাক হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী (রাঃ)-কে দান করেছেন" (মকতুবাত শরীফ মকতুব নং ১২৩ ৩য় খন্ড)। এবার ইবনে সামছ বলুন- আল্লাহ্ কি ক্ষমতা দিয়ে কুফরী করেছেন? হযরত মুজাদ্দিদ সাহেব কি এ কথা বলে কুফরী করেছেন? (নাউযুবিল্লাহ) দোয়ার মাধ্যমে তাক্বদীর পরিবর্তন হতে পারে বলে হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে।

মাসিক মদিনা নামের অন্তরালে মদিনা বিরোধী শিরক ও কুফরীর ব্যবসা করা সমিচীন নয়।

প্রশ্ন- ৮ ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ মাসিক মদিনার মার্চ সংখ্যার ৩৯ পৃষ্ঠায় ৮ নং দাবীতে বলেছে- *"কোন মৃত ব্যক্তিকে অছিলা বানিয়ে দোয়া করা*

বিদআত। কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পরে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁদের দোয়ার মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অছিলা করে দোয়া করেছেন বলে প্রমাণ নেই। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলতেন- আল্লাহ ছাড়া অপর কারুর দোহাই দিয়ে দোয়া করা কোন মতেই উচিত নয়। নবী, রাছুল, অলী, পীর বা আল্লাহর ঘর ইত্যাদিকে অছিলা করে দোয়া করা মাকরূহ তাহরীম, আর আযাবের দিক দিয়ে তা হারামের সমান। (সুন্নাত ও বিদআত পৃঃ-১২০)।" তার এই দাবী সঠিক কিনা?

ফতোয়া : ইবনে সামছ-এর দাবী দলীল বিহীন। সে "সুন্নাত ও বিদআত" নামক বই থেকে উদ্ধৃতি পেশ করেছে। এই বইটির লেখক জামাতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মৃত মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব। এটা কোন ফতোয়ার কিতাব নয় এবং লেখক একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। সুতরাং তার কথা বাতিল। ইবনে সামছ আর একটি মারাত্মক ভুল করেছে। সে বলেছে- কোন মৃত ব্যক্তিকে অছিলা বানিয়ে দোয়া করা বিদ্আত। তার প্রমাণ হিসাবে সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদাহরণ দিয়ে হুযুরকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত বলে সাব্যস্থ করেছে। নবীজী মৃত নন- বরং জীবিত ও হায়াতুন্নবী। অসংখ্য হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। যেমন হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে একথাও উল্লেখ রয়েছে- نَبِيُّنَا حَيٌّ يُرْزَقُ,অর্থাৎ- "আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সশরীরে রওযা পাকে জীবিত এবং রিযিক প্রাপ্ত"। তাবরানী শরীফে বর্ণিত হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর উক্ত হাদীসকে অস্বীকার করে ইবনে সামছ নিজেই কুফরী করেছে। শাহ্ আনওয়ার কাশ্মিরী দেওবন্দী তার ফয়জুল বারী-তে উল্লেখ করেছেন- সমস্ত নবীগণ সশরীরে জীবিত– একথার উপর সমস্ত উলামাদের ঐক্যমত্য রয়েছে। সে আর একটি মিথ্যা দাবী করে বলেছে- সাহাবীগণ হুযুরের ওফাতের পরে তাঁকে অছিলা বানিয়ে দোয়া করেছেন বলে নাকি কোন প্রমাণ নেই। এটা তার মিথ্যাচার। বরং নবীজীকে শুধু অছিলা নয়- রওযা মোবারকে গিয়ে সাহাবীগণ হুযুরের কাছে সরাসরি বৃষ্টি বর্ষণের জন্যও প্রার্থনা করেছেন। যেমন-

(ক) হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে মদিনায় অনাবৃষ্টি দেখা দেওয়ায় তিনি বেলাল ইবনে হারেস (রাঃ) নামক একজন সাহাবীকে রাছুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মোবারকে প্রেরণ করেন। হযরত বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ) রওযা মোবারকে গিয়ে সালাম আরয করার পর এভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَسْقِ لِاُمَّتِكَ فَاِنَّهُمْ قَدْهَلَكُوْا -

অর্থাৎ- "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আপনার উম্মতদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করুন- কেননা, তাঁরা অনাবৃষ্টির কারণে ধ্বংসের মুখামুখী হয়েছে"। এ প্রার্থনা জানিয়ে তিনি চলে আসলেন। এরপর রাত্রে নিদ্রাযোগে তিনি নবীজীর দীদার লাভ করলেন। হাদীসের উক্তি এরূপ-

فَاَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخْبَرَهُ اَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ -

অর্থাৎ- স্বপ্নযোগে হযরত বেলাল ইবনে হারেছ (রাঃ)-এর নিকট রাসুল করীম-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তশরীফ নিয়ে আসলেন এবং তাঁকে এই সংবাদ দিয়ে এরশাদ করলেন- "নিশ্চয়ই তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষিত হবে"।

এখানেও প্রমাণিত হলো যে, শুধু অছিলা নয়- বরং নবীজীর কাছে প্রার্থণা করাও সাহাবীগণের সুন্নাত।

(খ) ইবনে সামছ আর একটি বিষয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) নাকি বলেছেন- আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের দোহাই দেওয়া উচিত নয়। অছিলা আর দোহাই তো এক জিনিস নয়। দাবী হলো- অছিলা, আর দলীল দিচ্ছে দোহাই-র। দাবী ও দলীলের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। প্রবাদ বাক্য আছে- "আগুন লেগেছে গৌরীপুরায়- পানি ঢালছে চিনামুড়ায়"। অছিলা দেওয়া সুন্নাত।

(গ) ইবনে সামছ সর্বশেষ ভুলটি করেছে- "নবী, রাসুল, অলী, পীর বা আল্লাহর ঘর ইত্যাদিকে অছিলা বানিয়ে দোয়া করা নাকি মাকরূহ তাহরীম এবং আযাবের দিক দিয়ে নাকি হারামের সমান"। এটার জন্য উদ্ধৃতি পেশ করেছে একজন বিতর্কিত ব্যক্তি মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের বই "সুন্নাত ও বিদআত" থেকে। এতে প্রমাণিত হলো- ইবনে সামছ আরবী কোন কিতাব পড়েনি- বরং সে বাংলা মৌলভী। হাদীসে এসেছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিম্মুস সালামগণকে এবং নিজেকে অছিলা বানিয়ে দোয়া করতেন। যেমন- যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচী এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর মা হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ (রাঃ)-কে জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন করেন- তখন তিনি নিজেকে এবং সমস্ত নবীগণকে অছিলা বানিয়ে এভাবে দোয়া করেছিলেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمِّىْ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْاَسَدِ وَوَسِّعْ مُضْجَعَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْاَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِىْ –

অর্থাৎ– "হে আল্লাহ্! তুমি আমার মাতৃতুল্য চাচী ফাতেমা বিনতে আছাদ-কে ক্ষমা করে দিও এবং তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিও- তোমার প্রিয় নবীর (আমার) উছিলায় এবং আমার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের উছিলায়" (যযবুল কুলুব)।

(ঘ) এছাড়াও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মসজিদে যেতেন, তখন বলতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ –

অর্থাৎ– "হে আল্লাহ্! আমি আমার সমস্ত প্রার্থনাকারী উম্মতকে উছিলা বানিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করি"। (আদিল্লাতু আহ্লিছ ছুন্নাত- সৈয়দ ইউসুফ রেফায়ী)

অতএব– নবী, ওলী ও পীর মাশায়েখগণের অছিলা দিয়ে দোয়া করা নবীজীর সুন্নাত। ইবনে সামছ নবীজীর সুন্নাত ও বানীর উপর মাকরূহ্ তাহ্রীম বা হারামের ফতোয়া আরোপ করে নিজেই কুফরী করেছে।

প্রশ্ন- ৯ ঃ মাসিক মদিনার মার্চ'০৩ সংখ্যায় ৩৯ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ ইবনে সামছ ৯নং দাবী করেছে যে, *"কবরকে কেন্দ্র করে যে মেলা ও উরস অনুষ্ঠিত হয়- তা বিদ্আত। কারণ, নবী করিম (দঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন (রহঃ)-দের থেকে তা প্রমাণিত নয়"*। তার এ দাবী কি সত্য?

ফতোয়া ঃ তার দাবী মিথ্যা এবং বেয়াদবীতে পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ সে কবর বলেছে। কবরে কোনদিন উরস হয় না। উরস হয় অলী ও সাহাবীগণের মাযার

শরীফে। দ্বিতীয়ত : সে উরসের সাথে 'মেলা' শব্দ যোগ করে তার দাবীর পক্ষে শুধু যুক্তি প্রদর্শন করেছে- কোন দলীল পেশ করতে পারেনি এবং পারবেওনা। তৃতীয়ত : সে উরসকে বিদ্আত বলে দাবী করে যুক্তি প্রদর্শন করেছে- উরস নাকি কুরুনে ছালাছা- অর্থাৎ নবী, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেঈন থেকে প্রমাণিত নয়- তাই বিদ্আত। বিদআত এবং তার ভাল মন্দ সম্পর্কে ইবনে সামছের সামান্যতম জ্ঞান থাকলেও এমন অর্বাচীনের মত কথা বলতো না। তাকে জিজ্ঞাস করি- চার মাযহাব, চার তরিকা কি নবী, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেঈনগণের যুগে ছিল? অথচ চার মাযহাবের এক মযহাব মান্য করা সর্বসম্মতভাবে ওয়াজিব এবং চার তরিকা বা কোন একটি গ্রহণ করা- তথা বায়আত হওয়া সুন্নাত। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী "কাউলুল জামীল" গ্রন্থে বায়আত হওয়া এবং চার তরিকার মধ্যে যে কোনটি গ্রহণ করাকে সুন্নাত বলেছেন। তদুপরি, জিজ্ঞাসা করতে চাই- দেওবন্দ মাদ্রাসা ও দেওবন্দী নেছাব বা পাঠ্য তালিকা কি ঐ চার যুগে ছিল? বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ সহ সিহাহ্ সিত্তার কিতাব কি ঐ চার যুগে ছিল? খাদ্য তালিকায় কি ঐ সময় পোলাও কোর্মা বিরিয়ানী ছিল? এগুলোকে বিদ্আত না বলে শুধু উরস শরীফকে টার্গেট করা হলো কেন? মূলত। বিদ্আত বলা হয় ঐ কাজ বা বিশ্বাসকে- যা কুরআন, সুন্নাহ্র নীতির পরিপন্থী- ইমাম শাফেয়ী।

ইবনে সামছ বা মাসিক মদিনার মুরুব্বী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ও তার পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ্ এবং ভারতীয় ওহাবী আন্দোলনের মূল নেতা ইসমাইল দেহলভী- গংরা উরসকে জায়েয বলে প্রমাণ সহ ফতোয়া দিয়েছেন- তা কি ইবনে সামছের জানা নেই?

এবার আসুন- উক্ত তিন মুরুব্বীর অভিমত পেশ করে ইবনে সামছকে শান্তনা দেই।

(১) ইসমাঈল দেহলভী তার "সিরাতে মুস্তাকীম" গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠায় বলেছে-

نفس عرس میں کوئی قباحت نہیں مگر ہیئت کذائیہ
یعنی تاریخ مقرر کرنا اور شیرنی پکانا اور دھوم
دھام کرنا ناجائز ہے-

অর্থ ঃ শুধু উরস অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোন দোষ ক্রটি নেই। কিন্তু দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা, শিরনী পাকানো এবং ধুমধাম করা নাজায়েয।

(২) হাজী ইমদাদুল্লাহ্ সাহেব দেওবন্দী তার "হাফ্ত মাছআলায়" লিখেছেন-

فقیر کا مشرب اس امر میں (عرس) یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیر ومرشد کی روح مبارک پر ایصال ثواب کرتا ہوں- اول قران خوانی ہوتی ہے- اور گاہ بگاہ اگر وقت میں وسعت ہو تو مولود پڑھا جاتا ہے پھر ما حضر کھانا کھلایا جاتا ہے اورا سکا ثواب بخش دیاجاتا ہے -

অর্থ ঃ "উরসের ব্যাপারে আমি অধম ইমদাদুল্লাহ্‌র প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে- "প্রতি বৎসর স্বীয় পীর মুর্শিদের রুহ্ মোবারকে ইছালে ছাওয়াব এভাবে করে থাকি- প্রথমে কোরআনখানী অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন সময় সুযোগ হলে মিলাদ শরীফও পড়া হয়। অতঃপর উপস্থিত খানা পরিবেশন করা হয় এবং এর সওয়াব বখশীষ করে দেয়া হয়"। (ফয়সালা হাফ্ত মাসআলা)।

এখানে উরস শরীফ, মিলাদ শরীফ এবং তাবাররুক বন্টন করারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৩) এবার দেখুন- রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর ফতোয়া। ফতোয়ায়ে রশিদিয়ার প্রথম খন্ড কিতাবুল বিদআত পৃষ্ঠা ৯২-তে উল্লেখ আছে- (মূল ছাপা দেখুন)।

بہت اشیاء ہیں کہ اول مباح تھیں- پھر کسی وقت منع ہو گئیں- مجلس عرس ومولود بھی ایسا ھی ہے- اھل عرب سے معلوم ہوا کہ عرب شریف کے لوگ حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں خاص کر علماء مدینہ منورہ

حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا عرس کرتے رہے
جنکا مزار شریف احد پہاڑ پرہے -

অর্থ ঃ "এমন অনেক কাজ আছে- যা প্রথমে মুবাহ্ ও জায়েয ছিল- কিন্তু পরবর্তী কোন এক সময়ে এসে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। উরস এবং মিলাদ শরীফও তদ্রূপ। আরববাসীদের নিকট থেকে জানা গিয়েছে যে, আরব শরীফের লোকেরা হযরত ছাইয়েদ আহমদ বাদাভী (রহঃ)-এর উরস শরীফ খুব ধুমধামের সাথে পালন করতেন। বিশেষ করে মদিনা মোনাওয়ারার আলেমগণ হযরত আমির হামযা (রাঃ)-এর মাযার শরীফে উরস মোবারক পালন করে আসছেন। তাঁর পবিত্র মাযার উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত"। (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৯২)।

বিঃদ্রঃ ফতোয়া রশিদিয়া মূল সংস্করন পৃথক পৃথক খণ্ডে ছিল। কিন্তু নূতন সংস্করন পূর্ণ এক খণ্ডে ১৯৮৭ ইং সালে ছাপা হয়েছে এবং মক্তবায়ে থানবী দেওবন্দ তা ছাপিয়েছে। এই নূতন সংস্করণে উক্ত উর্দু ইবারত সম্পূর্ণ গায়েব করে ফেলা হয়েছে। সুতরাং নূতন সংস্করণ গ্রহণযোগ্য নয়। পুরাতন সংস্করন দেখুন।

উপরোক্ত তিন মুরুব্বীর উরসের ফতোয়া আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ এবং বর্তমান ওহাবীদের বিরুদ্ধে এটম বোমা হিসাবে বিবেচিত হবে। মাসিক মদিনা নামের অন্তরালে প্রকৃত পক্ষে তারা "এন্টি মদিনা"-র কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। (উরসের ও মাযারের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন আমার লিখিত "আহ্কামুল মাযার" গ্রন্থে।

প্রশ্ন- ১০ ঃ মাসিক মদিনা মার্চ'০৩ সংখ্যার ৩৯ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ ১০ নং দাবী করেছে- *"মাযারে এসে বাচ্চাদের চল্লিশা করা, বাচ্চাদের মাথার চুল কামানো এবং মাযারে শিরনী রান্না করে তা বিতরণ করা কুসংস্কার- শরিয়ত বহির্ভূত। এসব কাজ যদি কবরস্থ অলী আল্লাহ্কে "কাযিউল হাজাত" (মকসুদ পূরণকারী) মনে করে করা হয়- তবে তা শির্ক হবে"*। তার এ দাবী সঠিক কি না?

ফতোয়া ঃ কোন্ কিতাবে লিখা আছে যে, মাযারে এসে বাচ্চাদের চল্লিশা করা, মাথার চুল কামানো বা শিরনী রান্না করে তা বিতরণ করা শরিয়ত বহির্ভূত ও কুসংস্কার? -তিনি তা উল্লেখ করেন নি এবং শরিয়তের কোন দলীলও পেশ করেননি- তাই তার দাবীটিই শরিয়ত বহির্ভূত।

তার শর্তাধীন কথায় বুঝা যায়- মাযারে গিয়ে এসব কাজ না করে কেউ যদি নিজ বাড়ীতে করে, তাহলে শরিয়তসম্মত হবে। যদি বাড়ীতে করা জায়েয হয়- তাহলে মাযারে গিয়ে করা নাজায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, মাযারে গিয়ে এসব করার উদ্দেশ্য হচ্ছে- মাযারস্থ অলী-আল্লাহ্‌র দোয়া নেয়া ও বরকত হাসিল করা। কোন সুন্নী মুসলমান অলী-আল্লাহ্‌গণকে "কাযিউল হাজাত" বা মকসুদ পূরণকারী মনে করে না- বরং খোদার কাছে সুপারিশকারী ও ওছিলা বলে বিশ্বাস করে। হাঁ, ওহাবীদের কথা স্বতন্ত্র। তারা এরূপ মনে করতে পারে। না হলে বলে কেন? অনুমান করে শরিয়তের কথা বলা মহাপাপ।

আজমীর শরীফ বা বাগদাদ শরীফ অথবা হযরত শাহজালাল (রহঃ) প্রমূখ অলী-আল্লাহ্‌গণের মাযারে যিয়ারতকারীগণ শিরনী রান্না করে ফকির মিছকিনদের মধ্যে বিতরণ করে তার সাওয়াব খাজা গরীব নওয়ায, বড়পীর সাহেব অথবা হযরত শাহজালালের রূহে বখশিষ করে দেন। এটা হাদীস মোতাবেক শুদ্ধ ও জায়েয। দেখুন! হযরত বিবি মরিয়মের আম্মা নিয়ত করেছিলেন- তিনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানকে বায়তুল মোকাদ্দাস-এর খেদমতে ওয়াক্‌ফ করে দিবেন। হযরত মরিয়মের জন্মের পর আল্লাহ্‌ তায়ালা সে নিয়ত পূরণ করার জন্য নির্দেশ করেন। বায়তুল মোকাদ্দাস একটি ইবাদতের ঘর- কোন অলী-আল্লাহ্‌ নন। ঘরের নিয়ত করা যেমন জায়েয- তদ্রূপ অলী-আল্লাহ্‌র মাযারের নিয়ত করাও জায়েয।

(ক) এ প্রসঙ্গে দলীল হিসাবে আবু দাউদ শরীফের একখানা হাদীস- যা মিশকাত শরীফে সংকলিত হয়েছে- তা উল্লেখ করা আবশ্যক বলে মনে করি। মিশকাত শরীফ 'বাবুন নুযুর' অধ্যায়ে উল্লেখ আছে-

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّنْحَرَ اِبِلًا بِبُوَانَةَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِّنْ اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوْا لَا- قَالَ هَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِّنْ اَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوْا لَا- فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْفِ

بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ -

অর্থ ঃ হযরত সাবেত ইবনে যাহহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার যুগে এরূপ মানত করেছিলেন যে, তিনি "বুয়ানাহ্" নামক এক জায়গায় একটি উট যবেহ্ করবেন। (বুয়ানাহ্ একটি জায়গার নাম- যা মক্কা থেকে ইয়ালমলমের পথে মধ্যখানে নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত)। অতঃপর তিনি রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে ঐ মানতের বিষয়টি জানালেন। হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন- ওখানে কি জাহেলিয়াত যুগের কোন মূর্তিপূজা হয়? সাহাবীগণ বললেন- না। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন- ওখানে কি মুশরিকদের মেলা বসে? সাহাবীগণ বললেন- না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- তাহলে তোমার নিয়্যত ও মানত পূরন করো। কারণ, আল্লাহ্‌র নাফরমানী হয়- এমন বিষয়ে মানত পূরণ করা জায়েয নয় এবং আদম সন্তান যে জিনিসের মালিক নয় এমন মানত পূরণ করাও জায়েয নেই"। (আবু দাউদ ও মিশকাত আরবী- পৃষ্ঠা ২৯৮ বাবুন্ নুযুর)।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নির্দিষ্ট কোন জায়গায় গিয়ে ঐ জায়গার মানত পূরন করা জায়েয- যদি ঐ জায়গায় কোন মূর্তিপূজা বা মুশরিকদের মেলা না হয়। অলী-আল্লাহ্‌দের মাযার উপরোক্ত দুইটির কোনটিই নয়। সুতরাং, এখানে গিয়ে চল্লিশা করা, চুলকাটা বা শিরনী বিতরণের মানত পূরন করা উক্ত হাদীস মতে জায়েয। ইবনে সামছ সম্ভবতঃ মিশকাত শরীফও পড়েননি। তিনি একজন গন্ডমূর্খ লোক। তার কথার কোনই মূল্য নেই। মাসিক মদিনা চোখ বন্ধ করে বা কোনরূপ যাচাই বাছাই না করেই উক্ত মতামত ছাপিয়ে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেছে। বাতিলপন্থীরা বিনা দলীলে দাবী করে ছোট্ট- কিন্তু খন্ডন করতে কষ্ট করতে হয় আমাদের। আল্লাহ্‌র কাছেই এর প্রতিদান চাই।

সিহাহ্ সিত্তার উক্ত হাদীস গ্রন্থে (আবু দাউদ) রাসুলে পাকের বানী দ্বারা কোন নির্দিষ্ট স্থানে মানত পূরণ করার বৈধতা প্রমানিত হওয়া সত্ত্বেও যারা এটাকে শরিয়ত বহির্ভূত বা শিরক বলে- তারা মূলতঃ নবীজীর উপরই ঐ ফতোয়া জারী

করে। আমরা সুন্নী মুসলমান নবীজীর অনুসরণ করি মাত্র। আমাদের সমালোচনা করলে তা নবীজীর উপরই বর্তায়। খোদা তায়ালা এসব বেদ্বীন থেকে পানাহ্ দিন।

প্রশ্ন- ১১ঃ মাসিক মদিনার মার্চ'০৩ সংখ্যায় ৩৯ পৃষ্ঠায় ইবনে সামছ ১১ নং দাবী করে লিখেছে- *"মাযারে বাতি দেওয়া কুসংস্কার এবং মাযারে সিজদা করা হারাম। এসব কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য"*। এখন জিজ্ঞাস্য হলো- তার কথা সঠিক কিনা?

ফতোয়াঃ ইবনে সামছ মাযারে বাতি দেওয়া ও সিজদা করার মধ্যে-বাতি দেওয়াকে বলেছে কুসংস্কার এবং সিজদা করাকে বলেছে হারাম। তার কথার ধরনে বুঝা যায়- বাতি দেওয়া কুসংস্কার, কিন্তু বাতি জ্বালানো কুসংস্কার নয়। আর, মাযারে সিজদা করলে হারাম হবে- জীবিত থাকা অবস্থায় সিজদা করা হারাম নয়। তার গোটা ভাষ্যটাই প্রতারনামূলক।

প্রকৃত মাসআলা হলো- অলী-আল্লাহ্গণের মাযারে বাতি জ্বালানো তাঁদের সম্মানার্থে জায়েয। সিজদা করা শরিয়তে হারাম- চাই জীবিত হোক বা ইনতিকাল প্রাপ্ত হোক। শুধু মাযারকে টার্গেট করা অলী বিদ্বেষের পরিচায়ক।

তবে জীবিত বা ইনতিকাল প্রাপ্ত পিতা-মাতা, পীর, বুযুর্গগণের কদম চুম্বন করা বা মাযারকে চুম্বন করা সাহাবাগণের আমলের দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- হযরত ফাতেমা (রাঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মোবারকে চিবুক বা গাল স্থাপন করতেন বলে নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। হযরত বেলাল (রাঃ) সিরিয়া হতে এসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মোবারকে মাথা ঘর্ষণ করেছিলেন বলে সহীহ্ সনদে পাওয়া যায়। (শিফাউস সিকাম ও আদিল্লাতু আহলুছ ছুন্নাত- গ্রন্থদ্বয় দেখুন)।

তদুপরি, নবম হিজরীতে আবদুল কায়েছ প্রতিনিধিদল মদিনা মোনাওয়ারায় হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে হুযুরের পবিত্র হাত ও কদম মোবারক চুম্বন করেছিলেন বলে মিশকাত শরীফে উল্লেখ আছে। সুতরাং, ইহা সাহাবীগণের সুন্নাত। যারা উপুর হয়ে কদমবুছিকে না জায়েয অথবা শিরকের সাথে তুলনা করে- তারা অজ্ঞ ও মূর্খ। ইবনে সামছের অবগতির জন্য বলি- মাসিক মদিনার উক্ত মার্চ'০৩ সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠায় নযর করে দেখুন- কি

লেখা আছে- "আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) উপুড় হয়ে মায়ের হাত-পা চুমুতে চুমুতে সিক্ত করে দিতে লাগলেন"। এই কাজটি একজন সাহাবীর- যিনি এজিদের পর মক্কা ও ইরাক শাসন করেছিলেন।

(ক) এবার দেখুন মিশকাত শরীফের কদম চুম্বনের হাদীস।

عَنْ زَرَاعٍ وَكَانَ فِيْ وَفْدِ عَبْدِالْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

অর্থ ঃ আবদুল কায়েছ প্রতিনিধি দলের সদস্য হযরত যিরা (রাঃ) বর্ণনা করেন- আমাদের প্রতিনিধি দলটি যখন মদিনা মোনাওয়ারায় পৌঁছল- তখন আমরা তাড়াতাড়ি করে আমাদের বাহন থেকে নেমে পড়লাম এবং রাসুল করিম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দস্ত মোবারক এবং কদম মুবারক চুম্বন করতে লাগলাম"। (আবু দাউদ সুত্রে মিশকাত শরীফ মুসাফাহা ও মুআনাকা অধ্যায় ৪০২ পৃষ্ঠায়)।

কাজেই কদম চুম্বন করা কিংবা মাযার চুম্বন করা- এমন কি, বেখোদ হয়ে কপাল ঘর্ষন করাও জায়েয- যেমন করেছিলেন হযরত বেলাল (রাঃ)। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে নিষেধ করেন নি।

তকিউদ্দিন সুবকী (রহঃ) সিফাউস সিকাম গ্রন্থে হযরত বেলালের মাথা ও কপাল ঘর্ষন করার বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন-

فَجَعَلَ (بِلَالٌ) يَبْكِيْ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلٰى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থাৎ- "হযরত বেলাল (রাঃ) দীর্ঘদিন পর স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়ে সিরিয়া হতে মদিনায় এসে রওযা মোবারকে উপস্থিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বেখোদ হয়ে রাসুলে পাকের রওযা মোবারকের উপর কপাল ঘষতে লাগলেন"। সাহাবীগণের কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা ওহাবীদের নাজায়েয স্বভাব।

এবার দেখা যাক- ইবনে সামছের প্রথম মাসআলা "মাযারে বাতি দেওয়া নাকি

কুসংস্কার"। তার দলীল বিহীন উক্ত দাবী কত অসার- তা আমরা প্রমাণ করবো।

১নং দলীল : মাযারে বাতি দেওয়া ও বাতি জ্বালানো সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়ায়ে শামীর ওস্তাদ আল্লামা আবদুল গনি নাবলুসী (রহঃ) "হাদিকাতুন নাদিয়া" গ্রন্থে লিখেন-

إِخْرَاجُ الشُّمُوْعِ إِلَى الْقُبُوْرِ بِدْعَةٌ وَإِتْلَافُ مَالٍ كَذَا فِى الْبَزَّازِيَةِ- وَهٰذَا إِذَا خَلَا عَنْ فَائِدَةٍ- وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْضَعُ الْقُبُوْرِ مَسْجِدًا أَوْعَلٰى طَرِيْقٍ أَوْكَانَ هُنَاكَ أَحَدٌ جَالِسٌ أَوْكَانَ قَبْرٌ وَلِيٍّ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ أَوْعَالِمٍ مِّنَ الْمُحَقِّقِيْنَ تَعْظِيْمًا بِرُوْحِهِ الْمُشْرِقَةِ عَلٰى تُرَابِ جَسَدِهٖ كَإِشْرَاقِ الشَّمْسِ عَلَى الْأَرْضِ إِعْلَامًا لِلنَّاسِ أَنَّهٗ وَلِيٌّ لِيَتَبَرَّكُوْا بِهٖ وَيَدْعُوا اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَهٗ فَيَسْتَجَابُ لَهُمْ فَهُوَ أَمْرٌ جَائِزٌ لَامَانِعَ مِنْهُ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ-

অর্থাৎ- "ফতোয়ায়ে বাযযাযিয়ায় উল্লেখিত মন্তব্য "কবরের নিকট বাতি নিয়ে যাওয়া বিদআত ও অপব্যয়"- ইহা তখনই প্রযোজ্য হবে- যখন বাতি জ্বালানোর মধ্যে কোন ফায়দা না থাকে। কিন্তু যদি কোন ফায়দা থাকে- যেমন (১) কবরস্থানে কোন মসজিদ থাকলে, (২) কবর যদি চলাচলের রাস্তার উপর হয়, (৩) যদি কোন লোক তথায় বসা থাকে (৪) উক্ত কবর যদি কোন অলী-আল্লাহর মাযার হয়, (৫) যদি কোন মোহাক্কিক আলেমের কবর হয়, তাহলে বাতি জ্বালানো জায়েয- তাদের পবিত্র আত্মার সম্মানে- যা জগত আলোকময়ী সূর্যের আলোর মতই তাঁদের পবিত্র মাযারকে আলোকিত করে আছে, তাঁরা যে আল্লাহর ওলী এবং তাঁদের দরবারে যে দোয়া কবুল হয় এবং তাঁদের মাযার থেকে যে বরকত লাভ করা উচিৎ- এ কথাগুলো প্রচার করার উদ্দেশ্যে মাযারে বাতি জ্বালানো জায়েয। এতে নিষেধ করার কিছুই নেই। কেননা, নিয়্যাতের উপরই আমলের ফলাফল নির্ভরশীল" (হাদিকা)।

২নং দলীল : মিশরের প্রসিদ্ধ হানাফী মুফতী আল্লামা আবদুল কাদের (রহঃ)

রচিত "তাহ্রীরুল মোখতার" গ্রন্থের ১ম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত ফতোয়া উল্লেখ আছে-

وَكَذَا (اَمْرٌ جَائِزٌ) اِيْقَادُ الْقَنَادِيْلِ وَالشَّمْعِ عِنْدَ قُبُوْرِ الْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالْاِجْلَالِ اَيْضًا- فَالْمَقْصَدُ فِيْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ- وَنَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْاَوْلِيَاءِ يُوْقَدُ عِنْدَ قُبُوْرِهِمْ تَعْظِيْمًا لَهُمْ وَمَحَبَّةً فِيْهِمْ جَائِزٌ اَيْضًا- لَايَنْبَغِى النَّهْىُ عَنْهُ-

অর্থাৎ- আউলিয়ায়ে কেরাম এবং নেককার বান্দাদের মাযারে তাঁদের সম্মানার্থে ঝালরবাতি ও মোমবাতি জ্বালানো সম্পূর্ণ জায়েয। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মহৎ। আর আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে জ্বালানোর উদ্দেশ্যে মোমবাতি ও জাইতুনের তৈল মানত করাও জায়েয। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁদেরকে সম্মান করা ও মহব্বত করা। একাজে বাধা দেয়া বা নিষেধ করা অনুচিত"।

<u>৩নং দলীল</u> : ইরাক, বাইতুল মোকাদ্দাস, মসূল-এর অন্তর্গত আম্বিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে অতি মূল্যবান ঝালরবাতি লটকানো হয় এবং বড় বড় মোমবাতি জ্বালানো হয়। মদিনা মোনাওয়ারায় রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মোবারকে বিগত ১৩ শত বৎসর ধরে ঝালরবাতি লটকানো হতো ও মোমবাতি জ্বালানো হতো। কিন্তু ইদানিং দুশমনে রাসুল নজদী সউদী সরকার তা বন্ধ করে রওযা মোবারককে অন্ধকার করে রেখেছে- গায়ের জোরে। আল্লাহ্ পাক তাদের কবল থেকে মক্কা মদিনা শীঘ্র মুক্ত করুন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সামহ্ ওহাবী অনুসারী- তাই বিনা দলীলে মাযারে বাতি দেওয়াকে কুসংস্কার বলে নিজেই কুসংস্কার করেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- لَاتَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ "আমার উম্মত ঐক্যবদ্ধভাবে গোমরাহীর কাজ করতে পারে না"। মাযারে বাতি জ্বালানো উম্মতের সর্বসম্মত কাজ।

সুতরাং, ইবনে সামছ উম্মতের খেলাফ করে নিজেই গোমরাহীর অতলতলে ডুবে আছে।

প্রশ্ন- ১২ ঃ ইবনে সামছ ১২ নং দাবী করেছে- *"মৃত ব্যক্তিদের কবরে ফুল দেওয়া শরিয়ত বিরোধী। কোন পীর দরবেশের মাযারে গিয়ে তার নিকট সম্মান বা টাকা পয়সা ভিক্ষা চাওয়া সুস্পষ্ট শিরক। সাওয়াবের নিয়তে কবরের চতুস্পার্শে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ"*। প্রশ্ন হলো- প্রমাণবিহীন তার এই দাবীর পিছনে কোন সত্যতা আদৌ আছে কি না?

ফতোয়া ঃ তার দাবীতে সত্যতার লেশমাত্রও নেই। সে তিনটি বিষয়ে তিন রকমের মন্তব্য করেছে। ফুল দেওয়াকে বলেছে শরিয়ত বিরোধী, সম্মান ও টাকা ভিক্ষা চাওয়াকে বলেছে শিরক এবং কবরের চতুর্পার্শে তাওয়াফ করাকে বলেছে নিষিদ্ধ। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মূলতঃ তিনটি কাজই জায়েয।

১নং দলীল ঃ এবার আমরা তার প্রথম দাবী খন্ডন করবো ফতোয়ায়ে আলমগীরী দিয়ে। উক্ত ফতোয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

وَضْعُ الْوَرْدِ وَالرَّيَاحِيْنِ عَلَى الْقُبُوْرِ حَسَنٌ وَاِنْ تَصَدَّقَ

بِقِيْمَةِ الْوَرْدِ كَانَ اَحْسَنُ كَذَا فِى الْغَرَائِبِ -

অর্থাৎ- "যে কোন কবরের উপর গোলাপ ফুল অথবা অন্য যেকোন সুগন্ধি ফুল অর্পন করা উত্তম। আর যদি উক্ত ফুলের মূল্য সমপরিমান দান করা হয়, তাহলে আরো উত্তম। গারায়েব নামক গ্রন্থে এরূপই ফতোয়া দেয়া হয়েছে" (আলমগীরী)। সাধারণ কবরে যদি ফুল চড়ানো জায়েয এবং উত্তম হয়, তাহলে অলীগণের মাযারে নাজায়েয হবে কেন? বরং অধিক উত্তম হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

২নং দলীল ঃ তাহ্‌তাভী আলা মারাকিল ফালাহ্ ৩৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

قَدْ اَفْتٰى بَعْضُ الْاَئِمَّةِ مِنَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ بِاَنَّ اُعْتِيْدَ مِنْ وَضْعِ

الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيْدِ سُنَّةٌ بِهٰذَ الْحَدِيْثِ -

অর্থাৎ- "মোতাআখখিরীন মুজতাহিদগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, কবরে সুগন্ধ ফুল স্থাপন করা এবং খেজুরের ডাল স্থাপন করা সুন্নাত। একটি হাদীসই ইহার ভিত্তি"। হাদীসখানা মিশকাত শরীফে এভাবে উল্লেখ আছে- (লেখক)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ- اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَايَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ- ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً- وَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا-

অর্থাৎ- "একদা হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযাব রত দুটি কবরের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অবস্থা দেখে মন্তব্য করলেন- এদের দুজনের উপর আযাব হচ্ছে। তাদের আযাব হচ্ছে এমন দুটি কাজের জন্য- যা থেকে বেঁচে থাকা খুব কঠিন কাজ ছিলনা। একজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে প্রস্রাবের ছিটা ফোটা থেকে সতর্ক ছিলনা এবং অন্যজনের আযাব হচ্ছে এ কারণে যে, সে চোগলখুরী করে বেড়াতো। একথা বলেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে দু'ভাগ করে প্রত্যেকটি কবরের উপর একটি করে পেড়ে দিয়ে বললেন- আশা করা যায়- যতক্ষন এই ডাল দু'টি তাজা থাকবে, ততক্ষণ তাদের কবরের আযাব লাঘব হবে"। (মিশকাত)

অত্র হাদীসে গাছের ডালের উল্লেখ থাকলেও অন্য যেকোন তাজা ফুল বা অন্য কোন তাজা বস্তু কবরে স্থাপন করলে ঐগুলির যিকিরের বরকতে কবরের আযাব হাল্কা হয়। সেজন্যই মুফতীগণ ফুলকে বেছে নিয়েছেন এজন্য যে, এতে সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ওহাবী ও মৌদূদীবাদীরা একদিকে অলীগণের মাযারে ফুল দেয়াকে শরিয়ত বিরোধী বলে- অন্যদিকে তাদের মন্ত্রী ২০০৩ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারীতে সাভার স্মৃতি সৌধের পাথরে ফুলের মালা অর্পণ করে এবং হিন্দুস্তানের দেওবন্দীরা মিঃ গান্ধীর স্মৃতিসৌধে ফুলের তোড়া অর্পণ করে। তাদের এই দ্বিমুখী নীতি খুবই হাস্যকর ব্যাপার।

তার দ্বিতীয় উক্তিঃ সাহায্য চাওয়া

এবার আসুন- মাযারে গিয়ে টাকা বা সম্মান চাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করি। কোন মাযারে গিয়ে টাকা চাওয়া বা সম্মান চাওয়া যায়েয- যদি তাঁকে উছিলা মনে করে চাওয়া হয়।

১নং প্রমাণ ঃ ইমাম গাযযালী (রহঃ) 'ইহ্ইয়াউল উলুম' গ্রন্থে বলেন-

مَنْ يُسْتَمَدُّ بِهِ فِيْ حَيَاتِهِ يُسْتَمَدُّ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ -

অর্থাৎ- "যাঁদের কাছে তাঁদের জীবদ্দশায় সাহায্য চাওয়া যায়- তাঁদের কাছে ইনতিকালের পরেও সাহায্য চাওয়া যায়েয"। মাসআলার মূলনীতি হলো এই- "কাউকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করে সাহায্য চাওয়া নাজায়েয- তবে খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাঁরা রুহানীভাবে সাহায্য করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা জায়েয"।

২নং প্রমাণ ঃ তাফসীরে কবীর সূরা ইউসুফের فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

اَلْاِسْتِعَانَةُ بِالنَّاسِ فِيْ دَفْعِ الضَّرَرِ وَالظُّلْمِ جَائِزَةٌ -

অর্থাৎ- "কারও যুলুম এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্য লোকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যায়েয"।

৩নং প্রমাণ ঃ মিশকাত শরীফ "বাবু যিয়ারাতিল ক্বুবুর" অধ্যায়ের হাশিয়ায় বলা হয়েছে-

وَاَمَّا الْاِسْتِمْدَادُ بِاَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوِالْاَنْبِيَاءِ فَقَدْ اَنْكَرَهُ كَثِيْرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ وَاَثْبَتَهُ الْمَشَايِخُ الصُّوْفِيَّةُ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ- قَالَ الْاِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَبْرُ مُوْسَى الْكَاظِمِ تِرْيَاقٌ مُجَرَّبٌ لِاِجَابَةِ الدُّعَاءِ- وَقَالَ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ مَنْ يُسْتَمَدُّ بِهِ فِيْ حَيَاتِهِ يُسْتَمَدُّ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ -

অর্থাৎ- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা পূর্ববর্তী

আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) ব্যতিত অন্যান্য কবরবাসীদের নিকট (অলী) রুহানী সাহায্য চাওয়া সম্পর্কে অনেক ফকিহ্গণই নিষেধ করেছেন। কিন্তু সুফী মাশায়েখগণ এবং কোন কোন ফকিহ্গণ একে বৈধও বলেছেন। ফকিহ্ এবং সুফী সাধকগণের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন- "হযরত মূছা কাযেম (রাঃ)-এর মাযার শরীফ (বাগদাদ) হচ্ছে দোয়া কবুলিয়াতের ক্ষেত্রে জহর মোহরার ন্যায় কার্যকর"। অন্য সুফী সাধক ও ফকিহ্ ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেছেন- "জীবদ্দশায় যাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যায়- মৃত্যুর পরও তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয"। ইহাকে আরবীতে ইস্তিগাছা বলে। ইহা সর্বসম্মতভাবে জায়েয। (তাফসীরে কবীর ১২ পারা)

ইবনে সামছ অন্যের বেলায় অলীগণের মাযারে কিছু টাকা বা সম্মান চাওয়াকে হারাম বললেও নিজেরা কিন্তু ধনীদের ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদা বা গরুর চামড়া চান ঠিকই। সে সময় নাজায়েযের কথা বেমালুম ভুলে যান।

তার তৃতীয় উক্তি ঃ মাযার তাওয়াফ প্রসঙ্গ

ইবনে সামছের তৃতীয় দাবী "সাওয়াবের নিয়তে" কবরের চতুষ্পার্শে তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। তার জবাবে বলা যায়-

প্রথম দলীল ঃ স্বয়ং আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব কবরের চতুর্দিকে "নিছবতের তাওয়াফ" করাকে জায়েয বলেছেন। হিফযুল ঈমান ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় থানবী সাহেব বলেন- "কবরের চতুষ্পার্শে তাওয়াফ হচ্ছে শাব্দিক অর্থে। অর্থাৎ- নিছবতের বা রুহানী সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য কবরের চারপাশে যে চক্কর দেওয়া হয়- উহা মক্কা শরীফের তাওয়াফের মত শরয়ী তাওয়াফ নয়। কাজেই ইহা জায়েয"। ইবনে সামছ হিফযুল ঈমানের মত একটি ছোট পুস্তিকার খবরও রাখেন না। বড়ই আশ্চর্য লাগে। সাওয়াবের নিয়ত সে কোথায় পেলো? কবর তাওয়াফ করা হয় নিছবত কায়েম করার জন্য- সাওয়াবের নিয়তে নয়।

দ্বিতীয় দলীল ঃ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) একদিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার পিতা আবদুল্লাহ্ এক ইহুদীর কাছে কিছু ঋণ রেখে ওহুদের ময়দানে শহীদ হয়েছেন। আমি ইহুদীকে খেজুর দিয়ে দেনা পরিশোধ করতে চাইলে সে খেজুর নিতে অস্বীকার করে। অতঃপর রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীকে ডেকে রাজী করালেন এবং হযরত জাবের (রাঃ)-কে বললেন- "আমি আসার পর তুমি খেজুর মাপতে শুরু করবে। একথা বলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেজুরের স্তুপের কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তিনবার স্তুপের চারদিকে তাওয়াফ করলেন"। এর বরকতে ইহুদীর দেনা পরিশোধ করেও অনেক খেজুর রয়ে গেলো।

এবার ইবনে সামছ বলুন! খেজুরের স্তুপের চতুর্দিকে হুযুরের তাওয়াফ করা কি শিরক ছিল? নাউযুবিল্লাহ!

প্রশ্ন- ১৩ ঃ ইবনে সামছ উক্ত সংখ্যায় ১৩নং দাবী করেছে- *"দরগাহ্ বা মাযারে ওরশ উপলক্ষে যে গান-বাজনা হয় এবং ঢোল-তবল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়ে থাকে- তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। ওরশ উপলক্ষে এবং অন্যান্য সময় মাযারের উপর চাদর টানানো মাকরূহ"*। তার এই কথা কতটুকু সত্য?

ফতোয়া ঃ ইবনে সামছ উরসকে হারাম বলেন নি- বরং উরুস উপলক্ষে গান-বাদ্য, ঢোল-তবলা ইত্যাদিকে হারাম বলেছেন। এতে বুঝা যায়, অন্য সময় গানবাদ্য বা ঢোল-তবলা বাজানো জায়েয। তার কথা মোটেই সত্য নয়। গানবাদ্য উরসে হোক বা যেকোন সময় হোক- তা হারাম। কিন্তু তাদের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ্ সাহেব তার "হাফ্ত মাছআলায়" বলেছেন- "ছামা জায়েয- চাই বাদ্য ছাড়া হোক- কিংবা বাদ্যযন্ত্র সহ হোক"। এখন তিনিই বলুন- দেওবন্দীদের পীর হাজী সাহেব উক্ত ফতোয়া দিয়ে হারাম কাজ করেছেন কিনা?

এখন রইলো মাযারে চাদর লটকানোর বিষয়। নিঃসন্দেহে চাঁদর চড়ানো জায়েয।

<u>১ম প্রমাণ ঃ</u> মিশরের বিখ্যাত মুফতী আল্লামা আবদুল কাদির (রহঃ) তাঁর "তাহ্রীরুল মোখতার" কিতাবের ১ম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

وَضْعُ السُّتُوْرِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلٰى قُبُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ اَمْرٌ جَائِزٌ اِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذٰلِكَ التَّعْظِيْمَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ حَتّٰى لَايَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ الْقَبْرِ-

অর্থাৎ- "উলামা, বুযুর্গ ও আউলিয়ায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা জনগণের কাছে তুলে ধরার নিয়তে এবং লোকেরা যেন উক্ত অলীকে হীন মনে না করে-

এই উদ্দেশ্যে তাঁদের মাযার শামিয়ানা, পাগড়ী বা গিলাফ দ্বারা আবৃত করা শরীয়ত মোতাবেক জায়েয"। (তাহ্রীরুল মোখতার)

২য় প্রমাণ ঃ ফতোয়ায়ে শামী ৫ম খন্ড "লেবাছ" অধ্যায়ের পরিশিষ্টে ২৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

كَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَضْعَ السُّتُوْرِ وَالْعَمَائِمِ وَالثِّيَابِ عَلٰى قُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ وَالْاَوْلِيَاءِ- قَالَ فِيْ فَتَاوٰى الْحُجَّةِ وَتُكْرَهُ السُّتُوْرُ عَلَى الْقُبُوْرِ- وَلٰكِنْ نَحْنُ نَقُوْلُ الْاٰنَ اِذَاقُصِدَ بِهِ التَّعْظِيْمُ فِيْ عُيُوْنِ الْعَامَّةِ حَتّٰى لَايَحْتَقِرُوْا صَاحِبَ الْقَبْرِ وَلِجَلْبِ الْخُشُوْعِ وَالْاَدَبِ لِلْغَافِلِيْنَ الزَّائِرِيْنَ فَهُوَ جَائِزٌ- لِاَنَّ الْاَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ-

অর্থাৎ- "বুযুর্গানেদ্বীন ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারের উপর সামিয়ানা, পাগড়ী ও গিলাফ চড়ানোকে কোন কোন ফিকাহ্‌বিদ মাকরূহ বলেছেন। যেমন- ফতোয়ায়ে হাজ্জায় কবরের উপর সামিয়ানা চড়ানোকে মাকরূহ বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা বর্তমানকালের মুতাআখখিরীন ফকিহ্‌গণের সর্বশেষ চূড়ান্ত ফতোয়া হলো- মাযারে সামিয়ানা, পাগড়ী বা গিলাফ চড়ানোর উদ্দেশ্য যদি জনগণের দৃষ্টিতে মাযারবাসীর সম্মান প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে- যাতে তারা কবরবাসীকে হীনজ্ঞান না করে এবং অসতর্ক গাফেল যিয়ারতকারীদের মনে আদব ও নম্রতা সৃষ্টি হয়- তাহলে উহা জায়েয। কেননা, আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল"। (ফতোয়া শামী)।

এতে বুঝা গেলো- সর্বশেষ ফতোয়া হলো- অলী-আল্লাহ্‌গণের সম্মান ও আদব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সামিয়ানা ও গিলাফ চড়ানো জায়েয। ওহাবীরা ফতোয়া অনুসন্ধান না করেই নবী ও অলীগণের বিরুদ্ধে দেওবন্দী নজদী গীত গেয়ে চলেছেন। শতবার এসব মাছায়েল প্রচার করা হয়েছে- কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত না করে তারা সউদী পেট্রো ডলারের লোভে তাদের পক্ষে অন্ধের মত প্রচারনা চালিয়েই যাচ্ছে।

প্রশ্ন- ১৪ঃ মাসিক মদিনা মার্চ ২০০৩ সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ ১৪ নম্বরে দাবী করেছে- *"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কবরে বাতি জ্বালানো ও সিজদা করার উপর অভিশাপ করেছেন। তিনি কবর যিয়ারতকারী মেয়েলোক এবং যারা কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ বা কোব্বা নির্মাণ করে, তাদেরকে অভিশাপ করেছেন (আহমেদ)। তিনি নিষেধ করেছেন কবরকে পাকাপোক্ত ও শক্ত করে বানাতে, তার উপরে কোন রকম নির্মাণ কাজ করতে, তার উপর বসতে ও তার উপর কোন কিছু লিখতে (মুসলিম)। তিনি বলেছেন- আমার কবরকেন্দ্রে মেলা বসাবে না- (নাসাঈ, আবু দাউদ)। সুতরাং অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা হলে কি হতে পারে"?* এখন প্রশ্ন হলো- ইবনে সামছের এই প্রমান বিহীনদাবীগুলো কতটুকু সত্য?

ফতোয়াঃ ইবনে সামছ ঈমানদার মুসলমানকে ধোকায় ফেলার জন্য চোখ বুঝে কতগুলো অবাস্তব ও অসত্য কথা তুলে ধরেছে। যেমন (১) কবরে বাতি জ্বালানো (২) কবরে সিজদা করা (৩) মহিলা যিয়ারতকারিনীর উপর লা'নত (৪) কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ বা কোব্বা নির্মাণ করা (৫) কবর পাকাপোক্ত করা ও তার উপর কিছু লিখা (৬) হুযুর (দঃ)-এর কবরকেন্দ্রে মেলা বসানো।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ এই ছয়টি কাজকে হারাম ও নাজায়েয বলে দাবী করে শুধু চারটি হাদীস গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছে মাত্র- কিন্তু হাদীস উল্লেখ করেনি এবং হাদীসের ব্যাখ্যাকারী কোন ইমামের নামও উল্লেখ করেনি। এতেই বুঝা গেল, সে গদবাধা কিছু কথা বলেছে- এ সম্পর্কে তার পুর্ণ জ্ঞান নেই। এটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, কোন জিনিসকে হারাম, নাজায়েয, মাক্রূহ তাহ্রীমী, মাক্রূহে তানযিহী বা নিষিদ্ধ- এমন ধরনের কিছু বলতে হলে ইমামগণের দলীল পেশ করা জরুরী। তা না হলে তার কথা বাতিল বলে গণ্য হবে। ইহাই ফতোয়ায়ে শামীর সিদ্ধান্ত। দলীল উল্লেখ না করে কোন কিছুকে হারাম বলাই হারামীপনা কাজ। সুতরাং, ইসলামী বিধান মতে তার কথা বাতিল হয়ে গেলো।

এবার আসুন- শরিয়তের ইমামগণ ঐ ৬টি বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে কি ফতোয়া দিয়েছেন- তা ধারাবাহিকভাবে জানা যাক-

(১) কবরে বাতি জ্বালানো প্রসঙ্গে

(ক) ফতোয়া শামীর লেখক আল্লামা ইবনে আবেদীন -এর ওস্তাদ ও মুজতাহিদ আল্লামা আবদুল গনী নাবলুসী রহমতুল্লাহি আলাইহি (ফিলিস্তিন) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হাদিকাতুন নাদিয়াতে কবরে বা মাযারে বাতি জ্বালানো জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন-

إِخْرَاجُ الشُّمُوْعِ إِلَى الْقُبُوْرِ بِدْعَةٌ وَإِتْلَافُ مَالٍ كَذَا فِى الْبَزَّازِيَّةِ- وَهٰذَا إِذَا خَلَا عَنْ فَائِدَةٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْضَعُ الْقُبُوْرِ مَسْجِدًا أَوْعَلٰى طَرِيْقٍ أَوْ كَانَ هُنَاكَ أَحَدٌ جَالِسٌ أَوْكَانَ قَبْرُ وَلِيٍّ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ أَوْعَالِمٍ مِّنَ الْمُحَقِّقِيْنَ تَعْظِيْمًا بِرُوْحِهِ الْمُشْرِفَةِ عَلٰى تُرَابِ جَسَدِهٖ كَاشْرَاقِ الشَّمْسِ عَلَى الْأَرْضِ إِعْلَامًا لِّلنَّاسِ أَنَّهٗ وَلِيٌّ لِيَتَبَرَّكُوْا بِهٖ وَيَدْعُوا اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَهٗ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ فَهُوَ أَمْرٌ جَائِزٌ لَامَانِعَ مِنْهُ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -

অর্থাৎ- বাযযাযিয়া নামক ফিকাহ গ্রন্থে "কবরে বাতি জ্বালানো বিদআত ও অপব্যয়"- বলে যা উল্লেখিত হয়েছে- তার ব্যাখ্যা হচ্ছে- বাতি জ্বালানো তখনই বিদআত ও অপব্যয় বলে গণ্য হবে- যখন বাতি নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোন ফায়দা বা উপকার না থাকে। কিন্তু যদি ফায়দা থাকে- যেমন, (১) যদি কবরের নিকট মসজিদ থাকে, (২) কবর যদি চলাচলের রাস্তার উপর হয় (৩) যদি কবরের পার্শে কোন যিয়ারতকারী লোক বসা থাকে (৪) কবর যদি কোন অলী আল্লাহর বা কোন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মুহাক্কিক আলেমের মাযার হয়- (যাদের পবিত্র আত্মা সমূহ জগত আলোকময়ী সূর্যের মত কবর রৌশনকারী), তাহলে তাঁদের প্রতি তাযিমও সম্মান প্রদর্শনার্থে মাযার আলোকিত করা জায়েয। আর এই বাতি জ্বালানোর দ্বারা লোকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তাঁরা আল্লাহর প্রিয় অলী বা বন্ধু। তাঁদের থেকে বরকত লাভ করা উচিত এবং তাঁদের মাযারে আল্লাহর নিকট দোয়া করলে তা সহজে কবুল হয়। এই

উদ্দেশ্যে এবং প্রথম তিন কারণে মাযারে বা কবরে বাতি জ্বালানো ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক জায়েয- এতে নিষেধাজ্ঞার কিছুই নেই। কেননা, হাদীসে উল্লেখ আছে- "ইন্নামাল আ'মালু বিন্ নিয়্যাত" অর্থাৎ- নিয়ত অনুযায়ীই কর্মফল নির্ধারিত হয়ে থাকে"। (হাদিকাতুন নাদিয়া)।

-উক্ত দলীল দ্বারা বুঝা গেল- মাযারে বাতি জ্বালানো জায়েয এবং এতে ফায়দাও আছে। শরিয়তের ব্যাখ্যাদাতা আল্লামা নাবলুসীর মত একজন মুজতাহিদের ফতোয়ার মোকাবেলায় আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছের মত একজন সাধারন মানুষের কথার কি মূল্য আছে? দেওবন্দী হলে তো এমনিতেই বাতিল।

(খ) মিশরের প্রসিদ্ধ হানাফী মুফতী আল্লামা আবদুল কাদের (রহঃ) রচিত "তাহ্রীরুল মুখতার" নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

وَكَذَا (اَمْرٌ جَائِزٌ) اِيْقَادُ الْقَنَادِيْلِ وَالشَّمْعِ عِنْدَ قُبُوْرِ الْاَوْلِيَاءِ وَالصُّلَحَاءِ مِنْ بَابِ التَّعْظِيْمِ وَالْاِجْلَالِ اَيْضًا- فَالْقَصْدُ فِيْهَا مَقْصَدٌ حَسَنٌ- وَنَذْرُ الزَّيْتِ وَالشَّمْعِ لِلْاَوْلِيَاءِ يُوْقَدُ عِنْدَ قُبُوْرِهِمْ تَعْظِيْمًا لَّهُمْ وَمَحَبَّةً فِيْهِمْ جَائِزٌ اَيْضًا- لَايَنْبَغِى النَّهْىُ عَنْهُ-

অর্থাৎ- "অনুরূপভাবে আউলিয়ায়ে কেরামও নেককার বুযুর্গ ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনার্থে তাঁদের মাযারে ঝাড়বাতি ও মোমবাতি জ্বালানো সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, একাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহৎ। এছাড়াও- আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে জ্বালানোর উদ্দেশ্যে মোমবাতি ও তৈলের মানত করাও জায়েয- কেননা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি সম্মান ও মহব্বৎ প্রদর্শন করা। একাজে নিষেধ করা বা বাধা দেয়া অনুচিৎ"। (তাহ্রীরুল মুখতার ১ম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠা)

(গ) বাস্তব ক্ষেত্রে সমগ্র উম্মতের আমল দ্বারাও মাযারে বাতি জ্বালানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মোবারক, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হযরত ইউনুছ

আলাইহিস সালাম, হযরত শিষ আলাইহিস সালাম, হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম, হযরত জরজীস আলাইহিস সালাম, হযরত আইউব আলাইহিস সালাম, হযরত সালেহ ও হযরত হুদ আলাইহিমাস সালামগনের রওযাতে সদা-সর্বদা বাতি জ্বালানো থাকে। জর্দানে হযরত মূছা আলাইহিস সালাম ও হযরত ইউশা ইবনে নূন আলাইহিস সালামের মাযারেও বাতি জ্বালানো হয়।

এছাড়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং শহীদানে কারবালা, হযরত গাউসুল আযম, হযরত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুছা কাযেম, হযরত সালমান ফারছী (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ), হযরত হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ), ইমাম গাযযালী, হযরত মারুফ কারখী, হযরত সিররি সাক্তী, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী, শেখ শিবলী, হযরত বাহলুল দানা, হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত হাসান আসকারী (রাঃ) প্রমূখ সাহাবী ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাযার সমূহে প্রতিনিয়ত নিয়মিতভাবে বাতি জ্বালানো হয়। পাক ভারতের হযরত দাতাগঞ্জ বখ্শ (রহঃ), হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তি আজমেরী (রহঃ), হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রহঃ), হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া (রহঃ) সহ সর্বত্রই তাঁদের সম্মানার্থে বাতি জ্বালানো হয়। এসব বাস্তব শরিয়তসম্মত কাজকে হারাম ও নাজায়েয বলা একমাত্র বাতিল ফের্কা ওহাবীদের কাজ। সউদী সরকার বিগত ৭৫ বৎসর যাবৎ সরকারী ফরমান বলে তথাকার মাযার সমূহ ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে বাতি জ্বালানো বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের এহেন ধৃষ্ঠতাপূর্ণ কাজকে কেউ দলীল হিসাবে পেশ করলে সেও বাতিলপন্থী বলে গণ্য হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ তাদেরই অনুসারী বলে মনে হয়। বাতিলপন্থীর কথাও বাতিল। অধিক জানতে হলে আল বাছায়ের গ্রন্থ এবং ফতোয়ায়ে আযিযী দেখুন।

(২) কবরে সিজদা করা প্রসঙ্গে

আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ শুধু কবরে সিজদা করাকে হারাম বলেছেন। তার কথায় বুঝা যায়- কবরে সিজদা না করে জীবিত অবস্থায় সিজদা করলে তা দুরস্ত হবে। আসলে কোন সিজদাই জায়েয নেই। সিজদা দুই প্রকার। যথা- (১) ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা (২) তাযিমার্থে সিজদা করা। ইবাদতী সিজদা শিরক এবং তাযিমী সিজদা কবিরা গুনাহ্। ইহা শরিয়তে মোহাম্মদীর বেলায় প্রযোজ্য।

পূর্ববর্তী নবীগনের শরিয়তে সম্মানার্থে সিজদা করা মোবাহ্ বা জায়েয ছিল। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতামাতা ও আপন ভাইয়েরা তাঁকে তাযিমী সিজদা করেছিলেন। হযরত ইছা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ইহা জায়েয ছিল। আমাদের শরীয়তে হাদীসের মাধ্যমে ইহা হারাম করা হয়েছে। সিজদার পরিবর্তে সালাম প্রথা চালু হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পশুরা সিজদা করতো । এ অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও অন্যান্য সাহাবীগণ (রাঃ) আরয করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ! বনের পশুরা আপনাকে সিজদা করে- অথচ তারা বিবেকহীন। আমরা তো বিবেকবান। আমাদের তো আপনাকে তার আগেই সিজদা করা উচিৎ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তদুত্তরে এরশাদ করলেন-

لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ اِمْرَأَةً اَنْ تَسْجُدَ
زَوْجَهَا (مِشْكٰوة وَتَاتَارْخَانِيَّة وَرَدُّالْمُحْتَارْ)

অর্থাৎ- "যদি আমি কোন ব্যক্তিকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য" (মিশকাত, ফতোয়া তাতারখানী ও রদ্দুল মোহতার)।

টীকা ঃ তাযিমী সিজদার মাসআলা

(ক) ফতোয়া শামীতে উল্লেখ আছে-

اِخْتَلَفُوْا فِيْ سُجُوْدِ الْمَلَائِكَةِ قِيْلَ كَانَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالتَّوَجُّهُ
اِلٰى اٰدَمَ تَشْرِيْفًا كَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَقِيْلَ بَلْ عَلٰى وَجْهِ
التَّحِيَّةِ وَالْاِكْرَامِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ اَمَرْتُ
اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
(تَاتَارْخَانِيَّةٌ) قَالَ فِيْ تَبْيِيْنِ الْمَحَارِمِ وَالصَّحِيْحُ الثَّانِيْ
وَلَمْ يَكُنْ عِبَادَةً لَهٗ بَلْ تَحِيَّةً وَاِكْرَامًا وَلِذَا امْتَنَعَ عَنْهُ
اِبْلِيْسُ وَكَانَ جَائِزًا فِيْمَا مَضٰى كَمَا فِيْ قِصَّةِ يُوْسُفَ -

অর্থাৎ- ফিরিস্তাদের সিজদার প্রকৃতি সম্পর্কে তাফসীর বিশারদগণের মধ্যে দুইটি মতবাদ রয়েছে। একটি হলো- সিজদা ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্যে, আর আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন ক্বিবলা স্বরূপ- যেমন আমরা নামাযের সিজদা দেই আল্লাহকে এবং মুখ করি কা'বার দিকে। দ্বিতীয় মতবাদ হলো- ফিরিস্তাদের সিজদা ছিল হযরত আদম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্যেই- তবে ইবাদতের নিয়তে নয়- বরং তাযিম ও সম্মানার্থে। এই তাযিমী সিজদা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ ও বাতিল ঘোষিত হয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীসের মাধ্যমে। হাদীসখানা হলো- "আমি যদি কাউকে (তাযিমী) সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে আদেশ করতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য" (তাতারখানীয়া)। তাবয়ীনুল মাহারেম গ্রন্থে এই দ্বিতীয় মতবাদটিকেই বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ- হযরত আদম (আঃ) কেই সিজদা করা। ইহা ইবাদতের উদ্দেশ্যে ছিলনা- বরং তাযিম ও সম্মানের উদ্দেশ্যে ছিল। এজন্যই ইবলিছ সিজদা করা থেকে বিরত ছিল। প্রথম মতবাদ অনুযায়ী যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদার নির্দেশ হতো, আর হযরত আদমকে (আঃ) বানানো হতো ক্বিবলা স্বরূপ- তাহলে ইবলিছের সিজদা না করার কোন কারণ ছিল না। এই তাযিমী সিজদা বিগত শরিয়তে বৈধ ছিল- যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায়" (শামী)।

(খ) ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

وَمَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ اَوْقَبَّلَ وَجْهَ الْاَرْضِ
بَيْنَ يَدَيْهِ لَايَكْفُرُ وَلٰكِنْ يَأْثَمُ لِارْتِكَابِهِ الْكَبِيْرَةَ-هُوَالْمُخْتَارُ

অর্থাৎ- "কোন ব্যক্তি যদি বাদশাহর পায়ে সম্মানার্থে সিজদা করে অথবা তাঁর সম্মানে ভূমি চুম্বন করে, তাহলে কাফের হবে না- বরং কবিরা গুনাহে গুনাহগার হবে। ইহাই সর্বজন গৃহীত চূড়ান্ত ফতোয়া" (আলমগীরী)।

(গ) খাযানাতুর রিওয়ায়াত গ্রন্থে তাযিমী সিজদা সম্পর্কে উল্লেখ আছে-

قَالَ الْفَقِيْهُ اَبُوْ جَعْفَرْ مَنْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَيِ السُّلْطَانِ

اَوْ اَمِيْرٍ اَوْ سَجَدَ لَهُ فَاِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَايُكْفَرُ وَلٰكِنْ يَكُوْنُ اٰثِمًا مُرْتَكِبًا لِلْكَبِيْرَةِ -

অর্থাৎ– "ফকিহ্ আবু জাফর বলেছেন- কোন ব্যক্তি যদি বাদশাহ্ অথবা শাসন কর্তার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করে– অথবা তাকে সিজদা করে-তা হলে যদি সে সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজদা করে থাকে, তাহলে কাফের বা মুশরিক হবে না। কিন্তু কবিরা গুনাহ্‌র কারণে শক্ত গুনাহ্‌গার হবে" (খাযানাতুর রিওয়ায়াত)

(ঘ) ফতোয়ায়ে শামীতে যায়লায়ী গ্রন্থের উদ্ধৃতি-

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَذَكَرَ صَدْرُ الشَّهِيْدِ اَنَّهُ لَايُكْفَرُ بِهٰذَا السُّجُوْدِ لِاَنَّهُ يُرِيْدُ بِهِ التَّحِيَّةَ -

অর্থাৎ– "ইমাম যায়লায়ী তাঁর গ্রন্থে বলেছেন- সাদরুস শহীদ এ কথা বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন যে, তাযিমী সিজদার দ্বারা কেউ কাফের হয়না। কেননা, সে তাযিম ও সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজদা করেছে"।

-উপরোক্ত ৪টি দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তাযিমী সিজদা হারাম ও কবিরা গুনাহ্- কিন্তু শির্ক নয়। আশ্রাফ আলী থানবী সর্ব প্রকার সিজদাকে বলেছে শির্ক ও কুফরী এবং কিছু গোমরাহ্ লোক বলেছে মোবাহ্ ও জায়েয। তারা উভয়েই গোমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট। আবদুল্লাহ্ ইবনে সামিহ শুধু কবরের সিজদাকে হারাম বলে হয়েছে আরো ভ্রান্ত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কিছু লোক কদম চুম্বন ও মাযার চুম্বনকে সিজদা বলে অভিহিত করে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। কেননা, সাহাবীগণ রাসুলে পাকের কদমে মুখ লাগিয়ে চুম্বন করতেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) নবীজীর রওযা মোবারকে চিবুক লাগিয়ে পড়ে থাকতেন (আদিল্লাতু আহ্‌লিছ ছুন্নাত- ইউসুফ রেফায়ী)।

(৩) মহিলা যিয়ারতকারিনী প্রসঙ্গে

কবর, মাযার ও রওযা মোবারক সমূহ যিয়ারত করা সুন্নাত। এই সুন্নাত পুরুষদের বেলায় নিঃশর্তভাবে এবং মহিলাদের বেলায় কিছু বাধ্যবাধ্যকতা ও শর্ত সাপেক্ষে সুন্নাত। নারীর বেলায় শর্ত হলো- পর্দা করে এবং পৃথক স্থানে বসে

যিয়ারত করা, ঘনঘন ও মাত্রাতিরিক্ত যিয়ারত না করা এবং চিৎকার করে কান্নাকাটি না করা- বরং নীরবে ও নিঃশব্দে চোখের পানি ফেলা এবং ধৈর্য্য ধারন করা। আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছ্ একটি বৈধ কাজকে অবৈধ বলে শরিয়তের উপর মস্ত বড় যুলুম করেছে এবং হাদীসের খেলাফ করেছে। এবার শুনুন- মহিলাদের কবর যিয়ারতের দলীল সমূহ।

১নং দলীল ঃ মিশকাত শরীফ যিয়ারাতুল কুবুর অধ্যায়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ- اَلَا فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ (مُسْلِمْ)

অর্থাৎ- "আমি ইসলামের প্রাথমিক যুগে তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা (নারী পুরুষ নির্বিশেষে) কবর যিয়ারত করো- কেননা, ইহা পরকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়" (মুসলিম শরীফ)।

-ইসলামের প্রাথমিক সময়ে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ হওয়ার একাধিক কারণ মোহাদ্দেসীনে কেরাম বর্ণনা করেছেন। প্রথম কারন হলো- তখনও কবর যিয়ারত সম্পর্কে কোন অহী নাযিল হয়নি। দ্বিতীয় কারণ হলো- মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমান ও মুশরিকগণকে একই কবরস্থানে দাফন করা হতো। মদিনী যিন্দেগীতে মুসলমানদের পৃথক কবরস্থান করা হয়। তৃতীয় কারণ হলো- ইসলামের প্রাথমিক যুগ জাহেলিয়তের নিকটবর্তী হওয়াতে মুশরিকদের আচরনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ন হওয়ার আশংকা ছিল। মদিনী যিন্দেগীতে ওহীর মাধ্যমে কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করা হয়। হাদীসের প্রথম অংশ হলো মক্কী জীবনের নিষেধাজ্ঞামূলক এবং দ্বিতীয় অংশ হলো মদিনী জীবনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও অনুমতিসূচক। আরবী রীতি অনুযায়ী প্রথম অংশকে বলা হয় মানছুখ বা রহিত করন এবং দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় নাছেখ বা রহিতকারী- যার উপর আমল করতে হবে।

উক্ত হাদীসে কয়েকটি বিষয় সুপ্রমাণিত। যথাঃ-

(ক) اَلَا فَزُوْرُوْهَا শব্দটি দ্বারা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মোমেন নরনারীকে

কবর যিয়ারতের অনুমতি দেয়া হয়েছে (আইনী-শরহে বোখারী)।

(খ) হাদীসখানায় দূরত্বের কোন উল্লেখ নেই। কাজেই নিকটের বা দূরের- যেকোন কবর বা মাযারের যিয়ারতের জন্য সফর করাও সুন্নাত। বাংলাদেশ থেকে নিয়ত করে আজমীর শরীফ, বাগদাদ শরীফ, মদিনা শরীফ বা বায়তুল মোকাদ্দাসের মাযার সমূহ যিয়ারতের নিয়তে সফর করা জায়েয।

২নং দলীল ঃ সিরাজুল ওহহাজ নামক ফেকাহ্ গ্রন্থে নারীদের যিয়ারত জায়েয সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে -

وَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ لِلْاِعْتِبَارِ وَالتَّرَحُّمِ وَالتَّبَرُّكِ بِزِيَارَةِ الصَّالِحِيْنَ مِنْ غَيْرِ مَايُخَالِفُ الشَّرْعَ فَلَا بَأْسَ بِهٖ اِذَاكُنَّ عَجَائِزُ وَكُرِهَ لِلشَّابَّاتِ لِحُضُوْرِهِنَّ فِى الْمَسَاجِدِ لِلْجَمَاعَاتِ الْخَمْسَةِ- وَحَاصِلُهٗ اَنَّ مَحَلَّ الرُّخْصَةِ لَهُنَّ اِذَاكَانَتِ الزِّيَارَةُ عَلٰى وَجْهٍ لَيْسَ فِيْهِ فِتْنَةٌ- وَالْاَصَحُّ اَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لِاَنَّ سَيِّدَةَ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا تَزُوْرُ قَبْرَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ جُمْعَةٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَزُوْرُ قَبْرَ اَخِيْهَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِمَكَّةَ- ذَكَرَهٗ بَدْرُ الدِّيْنِ الْعَيْنِىْ فِىْ شَرْحِ الْبُخَارِىِّ-

অর্থাৎ- সিরাজুল ওহহাজ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- "বুযুর্গানেদ্বীনের মাযার যিয়ারতের মাধ্যমে পরকালীন জীবনের জন্য উপদেশ গ্রহণ, কবরবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে যদি গমন করা হয় এবং শরিয়ত পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত না হয়, তা হলে বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য নিঃশর্তে জায়েয এবং যুবতী মহিলাদের বেলায় মাকরূহ্ সহ জায়েয। যেমন- মসজিদে পাঞ্জেগানা জামাতের উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা মহিলাদের যাওয়া জায়েয- কিন্তু যুবতী মহিলাদের যাওয়া মাকরূহ। মোদ্দা কথা হলো- কোন প্রকার ফিতনার

আশংকা না থাকলে মহিলাদেরও যিয়ারতে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। অধিক সহীহ রেওয়ায়াত মোতাবেক নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই কবর যিয়ারতে গমন করা সাধারণভাবে বৈধ। কেননা, মহিলাকুল শিরোমনি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রতি জুমার দিনে মদিনা শরীফ হতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আমির হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাযার শরীফ যিয়ারত করার জন্য গমন করতেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মদিনা শরীফ হতে ৫০০ কিঃ মিঃ দূরে মক্কা মোয়াযযমায় অবস্থিত আপন ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র মাযার যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করতেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) শরহে বোখারীতে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন" (সিরাজুল ওহহাজ)।

-এখন আবদুল্লাহ ইবনে সামছকে জিজ্ঞাসা করি- হাদীসের মর্ম আপনি বেশী বুঝেন- নাকি আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ)?

টীকা ঃ একটি হাদীসের অপব্যাখ্যার জবাব

কেউ কেউ একখানা হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বলে- যেমন বলেছে ইবনে সামছ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ -

উক্ত হাদীসখানার বিকৃত অর্থ করে তারা বলেছে- "নবী করিম (দঃ) কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদের উপর অভিসম্পাত করেছেন"। তাদের এ অপব্যাখ্যার জবাব হলো- তারা অর্থের মধ্যে বিকৃতি ঘটিয়েছে। প্রকৃত অর্থ হবে- "ঘনঘন অধিক যিয়ারতকারিনী মহিলাদের উপর রাসুল (দঃ) অভিসম্পাত করেছেন"। মোহাদ্দেসীনে কেরাম– বিশেষ করে মোল্লা আলী ক্বারী মিরকাতে এবং আল্লামা মানাভী তাইছির কিতাবে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। নবীজী সাধারণ যিয়ারতকারিনীদের উপর লানত বা অভিসম্পাত করেন নি। সেজন্যই মোবালাগার সিগা زَوَّارَاتٌ ব্যবহার করা হয়েছে- কিন্তু زَائِرَاتٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। زَائِرَاتٌ অর্থ হলো –সাধারন যিয়ারতকারিনী এবং زَوَّارَاتٌ অর্থ হলো– ঘনঘন যিয়ারতকারিনী। যদি সকল মহিলাদের জন্য

অভিসম্পাত করতেন- তাহলে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) কি করে ওহোদে ও মক্কায় গিয়ে যিয়ারত করতেন? বুঝা গেল- ওহাবীরা হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আইনী ও সিরাজুল ওহহাজ গ্রন্থদ্বয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এই সিদ্ধান্তের উপর অন্য কোন সিদ্ধান্ত হতে পারেনা। (দেখুন আল বাহায়ের ও গাউসুল ইবাদ গ্রন্থদ্বয়- ইস্তাম্বুল ছাপা)। সুতরাং পরিষ্কার হয়ে গেলো- আবদুল্লাহ্ ইবনে সামহ্ হাদীসের দোহাই দিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। সাধারণ সরল মানুষ কি করে তার এই জালিয়াতি ও প্রতারনা ধরতে পারবে? মুহাক্কিক ও সচেতন আলেম ছাড়া সাধারন আলেমও তাদের ধোকাবাজী ধরতে পারবেনা। দলীল হলেন আইনী (রহঃ)- ইবনে সামহ্ নয়।

(৪) কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ বা কোববা তৈরী করা প্রসঙ্গে

ইবনে সামহ্ ১৪ নম্বরে কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ ও কোব্বা নির্মাণ করাকে চোখ বন্ধ করে হারাম বলেছে এবং ইমাম আহমেদ-এর হাওয়ালা দিয়েছে- কিন্তু এবারত উল্লেখ করেনি। সুতরাং, তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

এবার আসুন দেখি- কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ, গম্বুজ নির্মান বা কোব্বা নির্মাণ সম্পর্কে শরিয়ত কি বলে?

(১) কোরআন মজিদে সূরা কাহাফে আসহাবে কাহাফের মাযারের উপর বা পার্শ্বদেশে মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا- رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ- قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا-

অর্থাৎ- "হে প্রিয় হাবীব! আপনি স্মরণ করুন- যখন আসহাবে কাহাফের ব্যাপারে মোমেন ও কাফেররা পরস্পর বিতর্ক করছিল- তখন কাফেররা বললো- তাঁদের কবরের উপর কোব্বা বা সৌধ নির্মাণ করো। তাদের পালনকর্তাই তাঁদের বিষয়ে ভাল জানেন। আসহাবে কাহাফের বিষয়ে যাদের (মুমিনদের) মতামত প্রবল হলো- তারা বললো- আমরা তাঁদের মাযারের

উপর অবশ্যই একটি মসজিদ নির্মাণ করবো" (সূরা কাহাফ ২১ আয়াত)।

-উক্ত আয়াতের দ্বারা অলী- আল্লাহগণের মাযারের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা এবং মাযারকে ঘিরে মসজিদ তৈরী করা জায়েয বলে প্রমানিত হলো।

তাফসীরে সাভীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে- "আসহাবে কাহাফ হযরত ইছা আলাইহিস সালামের বুযুর্গ উম্মত ছিলেন। হযরত ইছা আলাইহিস সালামের অন্তর্ধানের দুইশত বৎসর পরে দাক্ইয়ানুস নামক যালেম ও কাফের বাদশাহ্র ভয়ে ৭ জন অলী-আল্লাহ্ তাঁদের কুকুর সহ তরসুস শহরের একটি পাহাড়ের বৃহৎ গুহায় আত্মগোপন করেন। তাঁরা নিদ্রাবস্থায় তিনশত নয় বৎসর কাটিয়ে দেন। এরপর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে ঈমানদার বাদশাহ বিত্রুস-এর যুগ পান। তারপর ঐ গুহাতেই তাঁরা মৃত্যু বরণ করেন এবং ঐ গুহাতেই তাঁদের মাযার হয়। ঐ সময়ের লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়- একদল কাফের এবং অন্যদল মোমেন। কাফের ও মুমিন উভয় দলই আসহাবে কাহাফ-এর মাযার সম্বন্ধে বিতর্ক শুরু করে। কাফেরদল বললো- আমরা আমাদের নিয়মে মাযারের উপর কোব্বা বা সৌধ নির্মাণ করে পূজা অর্চনা করবো- যা তাদের মাযারকে গোপন করে রাখবে। অপরদিকে মুমিনদল বললো- আমরা মাযারকে কেন্দ্র করে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবো। অবশেষে মুমিনরাই জয়যুক্ত হয়ে মাযারে মসজিদ নির্মাণ করলো এবং তাতে নামায আদায় করতে লাগলো" (তাফসীরে জালালাইন ও তাফসীরে সাভী সূরা কাহাফ আয়াত নং ২১)।

জামাতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা আবদুর রহিম তার 'আসহাবে কাহাফ' বইয়ে এই মসজিদ তৈরীর ঘটনা স্বীকার করে লিখেছেন- "আসহাবে কাহাফের মাযারে মসজিদ তৈরী করা ও তাতে নামায আদায় করার বিষয়টি স্বতন্ত্র ঘটনা। অন্য মাযারে মসজিদ তৈরী করা জায়েয নয়"।

আল্লাহ পাক এই ঘটনা প্রশংসা সহ বর্ণনা করেছেন। তাই এটি ইসলামের দলীল। বিপথগামীদের আল্লাহ্ হেদায়াত নসীব করুন।

(৫) কবর পাকাপোক্ত করা এবং তার ওপর কিছু লিখা প্রসঙ্গে

আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারের উপর ছাদ বা গম্বুজ নির্মান করা ও মাযার পাকা করা শরিয়ত মোতাবেক জায়েয। আবদুল্লাহ্ ইবনে সামছের ১৪নং দাবী সত্য নয়। সে কোন দলীল উদ্ধৃত না করে মানুষকে ধোকায় ফেলেছে। তার খন্ডনে

নিম্নোক্ত অকাট্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো।

১নং দলীল ঃ সূরা কাহাফের ২১নং আয়াতে সাতজন আসহাবে কাহাফের মাযার পাকাপোক্ত করে তথায় নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আসহাবে কাহাফ ছিলেন আউলিয়া। তাঁদের মাযারে মসজিদ নির্মাণ করার উল্লেখ করে আল্লাহ্ পাক সূরা কাহাফে এরশাদ করেন- যা একটু আগেই উল্লেখ করেছি।

اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا + رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ + قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا -

অর্থাৎ- "হে প্রিয় হাবীব! আপনি আসহাবে কাহাফের বিষয়টি স্মরণ করুন- যখন আসহাবে কাহাফের মাযারের ব্যাপারে লোকেরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্ক করছিলো। কাফের দল বলেছিলো- আমরা তাঁদের মাযারের উপর কোব্বা বা গম্বুজ নির্মাণ করবো- যা তাঁদের মাযারকে গোপন করে রাখবে। তাদের পালনকর্তাই তাঁদের সম্পর্কে সর্বজ্ঞানী। আর মোমেনদল- যারা আসহাবে কাহাফের মাযারের ব্যাপারে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো- তাঁরা বললো- আমরা অবশ্যই তাঁদের মাযারের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করে নামায পড়বো ও ইবাদত করবো" (তাফসীরে জালালাইন ও তাফসীরে সাভী)।

-উক্ত আয়াতে আসহাবে কাহাফের উল্লেখ থাকলেও সকল অলীগণের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। উসুলে তাফসীরের বিধান অনুযায়ী শানে নুযুল খাস হলেও হুকুম আম হয়ে থাকে- যা সকল অলীর বেলায়ই প্রযোজ্য। পূর্ববর্তী শরিয়াতের কোন ঘটনা যদি প্রশংসার সাথে কোরআনে বর্ণিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট কোন হাদীস দ্বারা যদি তার বিপরীত কোন নিষেধাজ্ঞা না আসে- তাহলে তা আমাদের শরিয়তেও বহাল থাকবে। সুতরাং অলীগণের মাযার পাকা করা ও মাযারকে কেন্দ্র করে মসজিদ নির্মাণ করার বৈধতা উক্ত আয়াতের দ্বারাই সুপ্রমাণিত। (তাফসীরে রুহুল বয়ান উক্ত আয়াত)।

২নং দলীল ঃ ফিকাহ্‌র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুররে মোখতার জানাযা অধ্যায়ে মাযারের

উপর গম্বুজ নির্মাণ করা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে-

وَلَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ وَقِيْلَ لَابَأْسَ بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ -

অর্থাৎ- "কোন কোন মতে মাযারের উপর ইমারত বা গম্বুজ নির্মাণ করা অনুচিত। কিন্তু অন্য একটি মতে মাযারের উপর ইমারত নির্মাণ করা দোষনীয় নয়- মাকরূহ হওয়া তো দূরের কথা। ইহাই ফতোয়া হিসাবে গৃহীত" (দুররে মোখতার- জানাযা অধ্যায়)।

৩নং দলীল ঃ জগত বিখ্যাত ফতোয়ায়ে শামী প্রথম খন্ড (মিশরে মুদ্রিত) ৯৩৭ পৃষ্ঠায় মাযারের উপর গম্বুজ বা ছাদ নির্মানের বৈধতার উল্লেখ করে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে-

وَفِى الْاَحْكَامِ عَنْ جَامِعِ الْفَتَاوٰى وَقِيْلَ لَايُكْرَهُ الْبِنَاءُ اِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ -

অর্থাৎ- "জামেউল ফতোয়ার বরাতে 'আহকাম' নামক গ্রন্থে এ মর্মে ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তি পীর-অলী, উলামা অথবা সাইয়েদ হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের মাযারের উপর পাকা ইমারত নির্মাণ করা বিনা মাকরূহতেই জায়েয" (ফতোয়া শামীঃ ৯৩৭ পৃঃ)।

উক্ত ফতোয়া অনুযায়ী আউলিয়া, উলামা, সাইয়েদগণের মাযারের উপর ইমারত নির্মাণ করা নিঃসন্দেহে জায়েয বলে প্রমাণিত হলো। ইহার ওপরই আমল করা হচ্ছে।

৪নং দলীল ঃ বিখ্যাত তাফসীরে রুহুল বয়ান ৮৭৯ পৃষ্ঠা ও মাজমাউল বিহার ৩য় খন্ড ১৮৭ পৃষ্ঠায় কোব্বার বৈধতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে-

وَقَدْ اَبَاحَ السَّلَفُ اَنْ يُّبْنٰى عَلٰى قُبُوْرِ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ الْمَشَاهِيْرِ لِيَزُوْرَ النَّاسُ وَيَسْتَرِيْحُوْنَ فِيْهِ -

অর্থাৎ- "ইসলামের প্রথম যুগের উলামাগণ পীর মাশায়েখ ও বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের মাযারের উপর ইমারত নির্মাণ করা ও তাতে বিশ্রাম নেওয়াকে মোবাহ্ ও জায়েয বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন"। (তাফসীরে রুহুল বয়ান)

উল্লেখ্য যে, সালাফ বলা হয়- সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনগণকে। তাঁদের পরবর্তীযুগের মুফতীগণকে বলা হয় খালাফ। সুতরাং, পূর্ববর্তীযুগেই মাযারে ইমারত নির্মাণকে মোবাহ্ ও বৈধ বলা হয়েছে। বর্তমান যুগের ওহাবী দেওবন্দীরা সালাফও নয়- খালাফও নয়। ইবনে সামছের মত লোকেরতো হিসাবই নেই- তাদের কথার কি মুল্য থাকতে পারে?

<u>৫নং দলীল ঃ</u> পাক ভারত উপমহাদেশের সর্বজন স্বীকৃত আলেম শেখ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব-(উর্দূ সংস্করণ)-এ উল্লেখ করেছেন-

مزارات پر قبہ بنانا صحابہ وسلف صالحین سے ثابت ہے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رض نے اورانکے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رح نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہء اطہر پرمکان اور عالی شان گنبد بنایاہے -

অর্থাৎ- "মাযার সমূহের উপর ইমারত ও কোব্বা নির্মাণ করা সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের সাল্‌ফে সালেহীনদের কর্মের দ্বারা সুপ্রমাণিত। যেমন, সর্বপ্রথম হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং পরবর্তী উমাইয়াযুগের খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিয (রহঃ) ৮৬ হিজরীতে হুযুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের রওযায়ে আত্হারের উপর ইমারত ও আলীশান গম্বুজ নির্মান করেছিলেন" (জযবুল কুলুব)।

-উল্লেখ্য যে, রওযায়ে আত্হারে হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মাযারও অন্তর্ভূক্ত। উনাদের মাযারসহ ইমারত নির্মাণ ও আলীশান গম্বুজ তৈরী করার কাজ সাহাবা যুগেই সম্পাদিত হয়েছে। অলীগণের মাযারের উপর ইমারত নির্মানের দলীল এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে? এমন কাজকে নাজায়েয বলে ইবনে সামছ রাসুল ও সাহাবী দুশমনির প্রমান দিলো। সে নিজেই লা'নতের যোগ্য হয়েছে- অন্য কেউ নয়।

<u>৬নং দলীল ঃ</u> বোখারী শরীফ প্রথমখন্ড জানাযা অধ্যায়ে বর্নিত আছে- "উমাইয়া

খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেকের যুগে (৮৬ হিজরী) একবার রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রওযা মোবারকের একদিকের দেওয়াল ধ্বসে গেলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উহা মেরামত শুরু করে দেন। মেরামতের সময় মাটি খনন কালে হঠাৎ করে একখানা পা মোবারক দৃষ্টিগোচর হলো। উপস্থিত সাহাবী ও তাবেয়ীনগণ মনে করলেন- ইহা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কদম মোবারক। কিন্তু সেখানে উপস্থিত সাহাবী হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা (হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাগিনা) সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন -

لا-وَاللهِ مَا هِيَ قَدَمُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا هِيَ اِلَّا قَدَمُ عُمَرَ-

অর্থাৎ- "খোদার শপথ। ইহা রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কদম মোবারক নয়- ইহা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কদম"। (বুখারী শরীফ)

-উক্ত ঘটনার দ্বারা প্রমানিত হলো যে, সাহাবায়ে কেরামই সর্বপ্রথম নবী করিম সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর রওযা মোবারক পাকা করেছিলেন। যদি মাযার পাকা করা নাজায়েয হতো- তাহলে সাহাবীগণ কখনই তা করতেন না। অতএব, মাযার পাকা করা সাহাবীগণেরই সুন্নাত।

অনেক সাহাবীই বিভিন্ন মাযার পাকা করেছিলেন। যেমনঃ হযরত ওমর(রাঃ) উম্মুল মোমেনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-এর মাযারের উপর গম্বুজ নিমার্ণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে হযরত আয়েশা (রাঃ) মক্কা শরীফে তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর মাযারের উপর গম্বুজ নির্মান করেছিলেন। তায়েফে অবস্থিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মাযার পাকা করেছিলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী ও হযরত আলী (রাঃ)-এর পুত্র মুহাম্মদ বিন হানফিয়া (রহঃ)। (দেখুন বিস্তারিত বিবরন "মুন্তাকা শরহে মোয়াত্তা এবং বাদায়ে সানায়ে।)

ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আন্হুর পুত্র দ্বিতীয় হাসান (রাঃ) ইনতিকাল করার পর তিনির বিবি তাঁর মাযারের উপর একটি কোব্বা তৈরী করেছিলেন এবং এক

বৎসর পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেছিলেন। কোন সাহাবী এতে বাধা দেননি। (বুখারী ১ম খন্ড কিতাবুল জানায়েয)।

সুতরাং, শুধু মুসলিম শরীফের নাম উল্লেখ করলেই হয় না- হাদীসও উল্লেখ করতে হয় অথবা অনুবাদ উল্লেখ করতে হয়। অতএব, আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সামছের ১৪নং দাবী বাতিল বলে গন্য হবে। মনে হয়- সে একজন পাকা নবী বিদ্বেষী এবং তার মাথায় কিছু গোলমাল আছে।

(৬) হুযুর (দঃ)-এর কবরকেন্দ্রে মেলা বসানো প্রসঙ্গে

আব্দুল্লাহ্ ইবনে সামছ নাসায়ী ও আবু দাউদ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে- নবীজী নাকি এরশাদ করেছেন "আমার কবরকেন্দ্রে মেলা বসাবেনা"- তার এই ধৃষ্টতামূলক অনুবাদ ডাহা মিথ্যা। হাদীস শরীফের এবারত হচ্ছে-

لَاتَتَّخِذُوا قَبْرِيْ عِيْدًا-

অর্থাৎঃ "আমার রওযা মোবারককে দুই ঈদগাহের মত বানাইওনা"। এই হাদিসে "ঈদগাহ্" শব্দ এসেছে- মেলা নয়। মেলা হয় হিন্দুদের- যেখানে পূজাঅর্চনা করা হয় ও পাঠা বলী দেওয়া হয়। আল্লামা আবদুর রউফ মানাভী (রঃ) তার "তাইছির" গ্রন্থে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে- "তোমরা আমার রওযা মোবারককে ঈদ্‌গাহের মত বিরান বানাইওনা এবং বৎসরে মাত্র দুদিনের জন্য সমাগমস্থলে পরিনত করোনা- বরং সদা-সর্বদা যাতায়াত করো এবং সর্বদা যিয়ারত করো" (তাইছির- আল্লামা আঃ রউফ মানাভী)।

হাদীসের অন্তর্নিহীত ব্যাখ্যা ইহাই। সুতরাং, যারা রওযা মোবারকে সমাগম ও যিয়ারতকে 'মেলা' বলে ব্যাখ্যা করে- তারা মুসলমানই নয়। নবীজীর রওযা মোবারককে মেলা বলা জঘন্য কুফরী কাজ।

অন্যান্য অলীগনের মাযারে উরছ উপলক্ষে দোকান পাট বসে লোকজনদের খানাপিনা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করার জন্য। এটাকে মেলা বলা হিন্দুদের স্বভাব। কোন মুসলমান এরূপ কথা বলতে পারে না। দেওবন্দী অনুসারী চরমোনাই, মানিকগঞ্জ এবং উজানীর বার্ষিক সভায় ভাতের দোকান বসে। কেননা, তারা কাউকে খাওয়া পরিবেশন করে না । তাই বলে কি এটাকে মেলা বলা যাবে? ওলীগণের মাযারে উরস উপলক্ষে বাজার বসলে এটাকে মেলা বলা এবং তাদের নিজেদের বার্ষিক মাহফিলে দোকানপাট বসানোকে বাজার বলা-

ওলী বিদ্বেষের পরিচায়ক। মাযার যত বেশি যিয়ারত করবে- দোয়া তত বেশি কবুল হবে। ইহাই শরিয়াতের মাছআলা। (১৪ নম্বরেই ৬টি মাছআলা সে উল্লেখ করেছে)।

প্রশ্ন- ১৫ ঃ ইবনে সামছ মাসিক মদিনা মার্চ সংখ্যা ২০০৩ইং-৪০পৃষ্ঠার ১৫ নম্বরে লিখেছে- "কোন কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করা বিদ্আত"। তার এ দাবী দলিল ভিত্তিক বা সঠিক কিনা?

ফতোয়া ঃ ইবনে সামছের দাবী সম্পূর্ন মিথ্যা। কবর যিয়ারত করা যেমন সুন্নাত- তেমনিভাবে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও সুন্নাত। বিদ্আত বললে গুনাহ্ হবে। ইবনে সামছ বিদ্আত হওয়ার কোন দলিল পেশ করতে পারে নি। তাই তার দাবীটিই বিদ্আতী দাবী। এবার শুনুন- কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার দলীল সমূহ।

১নং দলীলঃ রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মোবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার ফযিলত মেশকাত শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَنِىْ زَائِرًا لَاتَحْمِلُهُ حَاجَةٌ اِلَّا زِيَارَتِىْ كَانَ حَقًّا عَلَىَّ اَنْ اَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ- رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ وَدَارُقُطْنِىُّ-

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়- বরং একমাত্র আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই সরাসরি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে, তার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করা আমার দায়িত্ব হয়ে যাবে" (তাব্রানী ও দারেকুতনী)।

-উক্ত হাদীসে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে- শুধু হুযুরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার জন্য। তা যদি বিদ্আত হতো- তাহলে কি তিনি সরাসরি সফর করতে বলতেন ? বুঝা গেল- ইবনে সামছের মনে কিছু নবী বিদ্বেষ আছে।

২নং দলীল ঃ ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থের মোকদ্দমায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাহাত্ম বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা শামী (রহঃ) লিখেছেন- "ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)

সুদূর ফিলিস্তিন থেকে সফর করে বাগদাদ শরীফে আসতেন এবং ইমাম আবু হানিফার মাযার যিয়ারত করে বরকত হাসিল করতেন। এতে তাঁর মকসুদ সাথে সাথে পূর্ণ হয়ে যেতো"। ইমাম শাফেয়ী বলেন-

اِنِّيْ لَاَتَبَرَّكُ بِاَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَجِيْئُ اِلٰى قَبْرِهٖ فَاِذَا عَرَضَتْ لِيْ حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَسَأَلْتُ اللّٰهَ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَتُقْضٰى سَرِيْعًا-

অর্থাৎ- "আমি (ইমাম শাফেয়ী) বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মাযারে আগমন করে থাকি। যখন কোন বিষয়ের সমাধান প্রয়োজন হতো- তখন দু'রাকআত নফল নামায পড়ে তাঁর মাযারে বসে আল্লাহর নিকট তা চাইতাম। সাথে সাথে আমার মকসুদ পূরন হয়ে যেতো"।

<u>৩নং দলীল ঃ</u> আল বাছায়ের ও গাউসুল ইবাদ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে- "হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আন্‌হা মদিনা শরীফ থেকে সফর করে মক্কা শরীফে এসে তাঁর ভাই হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নে আবু বকর (রাঃ)-এর মাযার যিয়ারত করতেন"। যদি কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বিদ্‌আত হতো- তাহলে হযরত আয়েশা (রাঃ) কখনও সে কাজ করতেন না।

<u>৪নং দলীল ঃ</u> "শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারাতে খাইরিল আনাম" গ্রন্থে ইমাম তকিউদ্দীন সুব্‌কী (রহঃ) হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুর একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেছাল শরীফের পর হযরত বেলাল (রাঃ) শোকে মদিনা শরীফ ছেড়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং জিহাদে শরিক হতে থাকেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তিনি স্বপ্নে দেখেন- রাসুল করিম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করছেন-

يَا بِلَالُ مَا هٰذَا الْجَفَاءُ !

-"হে বেলাল, এত কষ্টদান কেন"? (কেন তুমি মদিনায় আসোনা?)। স্বপ্ন দেখে হযরত বেলাল (রাঃ) বেচইন হয়ে পড়লেন এবং শীঘ্র মদিনা শরীফে এসে সোজা রওযা মোবারকে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং রওযা মোবারকে কপাল

ঘষতে লাগলেন-

(فَجَعَلَ يَبْكِيْ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِهِ الشَّرِيْفِ)।

অর্থঃ "হযরত বেলাল (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং রওযা মোবারকে কপাল ঘষতে লাগলেন"। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া- ইবনে কাছির)-এতেও প্রমানিত হলো- যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা হযরত বেলালের সুন্নাত।

<u>৫নং দলীল ঃ</u> বায়হাকী শরীফে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার ব্যাপারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একখানা হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ-اَلَا فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ-

অর্থাৎ- "আমি প্রথম দিকে (অহী না পাওয়া সাপেক্ষে) তোমাদেরকে কবর সমূহ যিয়ারত করতে বারন করেছিলাম। শুন, এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা, উহা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়" (বয়েহাকী)।

-উদ্ধৃত হাদীসে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে কবর যিয়ারতের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। দূরের হোক বা কাছের হোক- সকল কবরই এই হুকুমের আওতাধীন। সফর না করলে যিয়ারত কিভাবে সম্ভব হবে? সুতরাং, যিয়ারতের জন্য সফর করাও একই নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত। হজ্ব করতে গেলে সফর করতে হয়। ব্যবসা করতে গেলেও সফর করতে হয়। হজ্ব ও ব্যবসার নির্দেশ দিয়ে যদি সফর করতে নিষেধ করা হয়- তা হলে পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রহঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ "জাআল হক্ব" গ্রন্থে একটি নীতিমালা বর্ননা করেছেন। যথা-

(ক) কোন কাজ ফরয হলে তার জন্য সফর করাও ফরয। যেমন- হজ্ব। (খ) কোন কাজ ওয়াজিব হলে তার জন্য সফর করাও ওয়াজিব। যেমন- মানতের হজ্ব। (গ) কোন কাজ সুন্নাত হলে তার জন্য সফর করাও সুন্নাত। যেমন- কবর যিয়ারত। (ঘ) কোন কাজ মোবাহ্ হলে তার জন্য সফর করাও মোবাহ্। যেমন- ব্যবসা। (ঙ) কোন কাজ হারাম হলে তার জন্য সফর করাও হারাম। যেমন- চুরি ও যিনা।

উক্ত দলীল ও প্রমাণ সমূহের পর কেউ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে বিদ্আত বলে অভিহিত করলে সে-ই বড় বিদ্আতী ও বাতিল বলে গন্য হবে।

প্রশ্ন- ১৬ ঃ ইব্নে সামছের ১৬নং দাবী হলো- "প্রচলিত মিলাদ মাহফিল বিদ্আত। কারণ নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেঈন্ ও তাবে-তাবেঈনদের থেকে তা প্রমানিত নয়"। (মাসিক মদিনা, মার্চ-২০০৩ সংখ্যা)

-এখন জিজ্ঞাস্য বিষয় হলো- সত্যিই কি তার দাবীমতে ঐ যুগে মিলাদ মাহফিলের কোন অস্তিত্ব ছিলনা?

ফতোয়া ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্নে সামছের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা- বরং মিলাদ মাহফিলের আয়োজন স্বয়ং নবী করিম (দঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন (রাঃ)-গনের বাণী ও আমল দ্বারাই প্রমাণিত। ইব্নে সামছ্ নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবের হাওয়ালা উল্লেখ করেনি। এতেই তার ধোকাবাজী ও প্রতারণা ধরা পড়ে গেছে।

ইব্নে সামছের জন্মের ৫০০ ও ৮০০ বৎসর পূর্বের লিখিত তিনখানা নির্ভরযোগ্য আরবী কিতাব হতে এবারত উদ্ধৃত করে আমরা প্রমাণ করবো- মিলাদ মাহফিল স্বয়ং সাহাবীগণ উদযাপন করেছেন এবং নবী করিম (দঃ) তথায় উপস্থিত হয়ে মাহ্ফিলকারীদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তাছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীন মিলাদুন্নবীর মাহ্ফিলের ফযিলতও বর্ণনা করেছেন। তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন যুগের বুযুর্গানেদ্বীন মিলাদ মাহ্ফিলের বিশেষ ফযিলত বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ইবনে দাহ্ইয়া কৃত আত্ তানভীর, আল্লামা ইব্নে হাজর হায়তামী মক্কী- (রহঃ) কৃত "আন-নে'মাতুল কোব্রা আলাল আলম" ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) কৃত "সাবিলুলহুদা" নামক গ্রন্থত্রয় সারা পৃথিবীতে পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। এখন থেকে প্রায় ৮০০ ও ৫০০ বৎসর পূর্বে এগুলো রচিত। আমরা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উক্ত কিতাবত্রয়ের রেওয়ায়াতগুলো তুলে ধরছি। তাতেই ইবনে সামছের জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে- ইন্শা-আল্লাহ্।

<u>১নং প্রমান ঃ</u> ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতি কৃত "সাবিলুলহুদা" ও ইব্নে দাহ্ইয়াকৃত আত্-তানভীর গ্রন্থে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ-

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى بَيْتِ عَامِرِ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَيَقُوْلُ - هٰذَا الْيَوْمَ- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ عَلَيْكَ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَتَهُ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ (اَلتَّنْوِيْرُ فِيْ مَوْلِدِ النَّذِيْرِ الْبَشِيْرِ لِابْنِ دَحْيَةَ ٦٠٤ هج وَ سُبُلُ الْهُدٰى وَ الدُّرُّ الْمُنَظَّمُ)

অর্থঃ "হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত- তিনি বলেনঃ আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মদিনাবাসী হযরত আবু আমের আনসারী রাদিয়াল্লাহু আন্হুর গৃহে গমন করে দেখি- তিনি তাঁর সন্তানাদি ও আত্মীয়স্বজনকে একত্রিত করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বেলাদত বা জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বলছেন- আজই সেই দিন- অর্থাৎ ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ। এতদশ্রবনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- "হে আমের! আল্লাহ্পাক তোমার জন্য অসংখ্য রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং তাঁর ফিরিস্তাগণ তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করছেন" (ইবনে দাহ্ইয়া ৬০৪ হিঃ-এর আত্তানভীর, ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ূতি-এর সাবিলুল হুদা এবং আবদুলহক এলাহাবাদীর দূররে মুনাজজাম)।

২নং দলীল ঃ আবদুল হক এলাহাবাদীর আদ্দুররুল মুনাযযাম্, ইমাম ইবনে দাহ্ইয়া (৬০৪ হিঃ)-এর আত্-তান্ভীর ও মৌলুদে কবীর গ্রন্থে উল্লেখিত একখানা রেওয়ায়াতঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ بَيْتِهِ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ فَيَبْشِرُوْنَ وَيَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ - اِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَالَ

حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِيْ- (اَلدُّرُّ الْمُنَظَّمُ - اَلْمَوْلُوْدُ الْكَبِيْرُ - اَلتَّنْوِيْرُ)

অর্থঃ "হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত- তিনি একদিন তাঁর নিজ ঘরে কিছু লোক জমায়েত করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেলাদাত বা জন্ম সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনা করে দরূদও সালাম পাঠ করে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা মূলক বর্ণনা উপস্থাপন করে খুশী বা ঈদ উদযাপন করছিলেন। এমন সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথায় উপস্থিত হলেন এবং মিলাদ শরীফ দেখে এরশাদ করলেন- "তোমাদের সবার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হয়ে গেলো" (দূররে মুনাযযাম্, মৌলুদে কবীর ও আত্-তানভীর)।

প্রিয় পাঠকগণ! উপরের দুখানা রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, পবিত্র বেলাদাতের ঘটনা বর্ণনা করে দরূদ ও সালাম পাঠ করলে রহমতের দরজা খোলা হয়, ফিরিস্তাগণ মাগফিরাতমূলক দোয়া করেন এবং নবী করিম (দঃ)-এর শাফাআত নসীব হয়। ইব্নে সামহু কত বড় বদনসীব যে, সে তিনটি কিতাবের একটিও পড়েনি। ইমাম ইব্নে দাহ্ইয়া ও ইমাম জালালুদ্দীন সয়ুতির উদ্ধৃতির পর আর কোন দলীলের প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। ইব্নে সামহ্ প্রচলিত মিলাদকে বিদ্আত বলে সে নিজেই বে-দা'তী হয়ে গেছে।

<u>৩নং দলীল ঃ</u> মক্কা শরীফের মুফতী আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ ৯৭৪ হিঃ) তাঁর জগত বিখ্যাত কিতাব "আন-নে'মাতুল কুব্রা আলাল আলম" গ্রন্থে খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক বর্ণিত মিলাদুন্নবী মাহ্ফিলের ফযিলত এভাবে উল্লেখ করেছেন-

فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَائَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِيْ فِى الْجَنَّةِ- وَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَى الْاِسْلَامَ - وَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَكَاَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ - وَ قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللّٰهُ
وَجْهَهُ وَرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ لَايَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا
بِالْاِيْمَانِ وَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى
عَلَى الْعَالَمِ فِيْ مَوْلِدِ سَيِّدِ وُلْدِ اٰدَمَ - لِلْعَلَّامَةِ شِهَابِ الدِّيْنِ
بْنِ حَجَرٍ هَيْتَمِيِّ الْمُتَوَفّٰى سَنَةَ ٩٧٤)

অর্থ- অধ্যায়ঃ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা-

"হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (দঃ) পাঠ করার জন্য এক দিরহাম খরচ করবে, সে জান্নাতে আমার সাথী হবে"।

"হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- যে ব্যক্তি সম্মানের সাথে মিলাদুন্নবী (দঃ) উদযাপন করবে, সে দ্বীন ইসলামকে পূনর্জীবিত করবে"।

"হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (দঃ)-এর জন্য এক দিরহাম খরচ করলো, সে যেন জঙ্গে বদর ও জঙ্গে হোনাইনে শরিক হলো" (কাফেরদের বিরুদ্ধে)।

"হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু ওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী (দঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং মিলাদুন্নবী (দঃ) উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে, সে ঈমানের সাথে দুনিয়া ত্যাগ করবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে" (মৃত্যুর সময় তওবা নসীব হবে। তওবা নসীব হলে সব গুনাহ্ মাফ। সুতরাং বিনা হিসাবে জান্নাত)।

(আল্লামা শিহাবুদ্দীন ইবনে হাজর হায়তামী (মৃত্যু ৯৭৪ হিঃ) কৃত আন-নে'মাতুল কোবরা আলাল আলম পৃষ্ঠা ৭ ও ৮)।

বিঃদ্রঃ ইবনে সাবুহু মাসিক মদিনায় দাবী করেছে- প্রচলিত মিলাদুন্নবী বিদআত।

কারণ, নবী করিম (দঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী দুই যুগের বুযুর্গদের দ্বারা নাকি প্রমাণিত নয়। পাঠকবর্গ দেখলেন- মিলাদ শরীফ স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সমর্থিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এরপরও যারা মিলাদুন্নবীর বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা হয় অন্ধ, নতুবা নবী ও সাহাবী বিদ্বেষী। এরা মুনাফিক। উক্ত গ্রন্থে হাসান বসরী তাবেয়ী, মারুফ কারখী তাবে তাবেয়ী, ছিররি ছাক্‌তি, জুনায়দ বাগদাদী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী- প্রমূখ বুযুর্গানেদ্বীন ও ইমামগণের মতামতও বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মিলাদ ও কিয়ামের বিধান, তাফসীরে রুহুল বয়ান ৯ম খন্ড ৫৬ ও ৫৭ পৃষ্ঠা, আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া, আত তানভীর, নুরুদ্দীন হালাবীর ইনসানুল ওয়ুন, জাওয়াহিরুল বিহার, আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী, আল্লামা ইবরাহীম হলবীর সিরতে হলবী, ইমাম আবু শামা, ইমাম বরজাঞ্জী, সামছুদ্দীন ইবনে জাজরী ও ইবনে হাজর হায়তামীর আন-নে'মাতুল কোব্‌রা প্রভৃতি।

প্রশ্ন- ১৭ ঃ ইবনে সামছ মাসিক মদিনা ২০০৩ মার্চ সংখ্যায় ১৭নং দাবী করেছে *"শবে-বরাত উপলক্ষে হালুয়া-রুটি বিতরন করা বিদ্‌আত"।* তার দাবী সঠিক কিনা?

ফতোয়া ঃ দাবী করলেই সঠিক হয়না- দলীল উল্লেখ করতে হয়। ইবনে সামছ দলীল উল্লেখ করেনি। তাই তার দাবী বাতিল। হালুয়া রুটী বিতরন করা উত্তম। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালুয়া ও রুটী বেশী পছন্দ করতেন। শবে বরাতে অধিকাংশ লোক নফল রোযা রাখেন। তাই ইফতারের জন্য হালুয়া ও রুটী বিতরন করা হয়। তদুপরি, ঐ রাত্রে মানুষের বার্ষিক রিযিক বন্টন করা হয় এবং হায়াত মউত ও রিযিক-দৌলত- তথা ভাগ্য লিখা হয়। এক কথায়- ঐ রাত্রিটি হলো ভাগ্যরজনী। ঐ রাত্রে সদকা খয়রাত করে কবরস্থ মুর্দেগানের রুহে বখশিয়ে দেয়া হয়।

মক্কা শরীফে ১৯৮৫ সালে শবে বরাতে এক সুন্নী আরবীর বাড়ীতে আমাদের ১৩ জন আলেম ও মাদ্রাসার প্রিন্সিপালকে দাওয়াত করে মিলাদ শরীফ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আমি মিলাদ শরীফ পাঠ করি এবং মৌলুদে বরজাঞ্জী হতে তাওয়াল্লাদ শরীফ তিলাওয়াত করি। মিলাদ শরীফ শেষে আমাদের সামনে হালুয়া-রুটী পেশ করা হয়। বাড়ীর মালিককে (ইঞ্জিনিয়ার) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করা হলে তিনি বললেন- রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালুয়া-রুটী পছন্দ করতেন, তাই দান খয়রাত স্বরূপ ইহা বিতরন করা হয়। দুষলাম- পৃথিবীর সর্বত্রই হালুয়া-রুটী বিতরনের ভিত্তি ও রেওয়াজ আছে। ইহা শরিয়ত মোতাবেক জায়েয। যে রেওয়াজ শরিয়তের মৌলিক নীতির পরিপন্থী নয়- উহা মোবাহ্ বা জায়েয। হালুয়া পাক, রুটীও পাক। এগুলোকে নাজায়েয বলা ওহাবীদের স্বভাব। তারা দোহাই দেয়- নবী বা সাহাবীর যুগে নাকি এগুলো ছিলনা- তাই বিদ্‌আত। তাকে জিজ্ঞাসা করি- পোলাও বিরিয়ানী কি তিনি খাননা? এগুলো কি নবী বা কোন সাহাবীর যুগে ছিল? খাওয়ার সময় মাসআলা কোথায় যায়? গরুর চামড়া কালেকশন করে খারেজী মাদ্রাসা পরিচালনা করা কি নবীজী বা সাহাবীর যুগে ছিল? দেওবন্দ মাদ্রাসা কি নবীজীর যুগে ছিল? তাহলে এগুলো জায়েয হলো কিভাবে? সব কাজে নবীজীর বা সাহাবীদের যুগের নজীর চাওয়া এক প্রকার বেয়াকুবী ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, ইসলামের সব কিছু নবীজীর যুগে চালু ছিলনা। শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ) বলেছেন- "উত্তম খানা ও উত্তম লেবাছ- যা নবীজীর যামানায় ছিলনা- তা খাওয়া ও ব্যবহার করা মোবাহ্ ও জায়েয"। শবে বরাতের হালুয়া রুটীও তদ্রূপ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালুয়া বেশী পছন্দ করতেন। তাই শবে বরাতে হালুয়া বিতরণ করা হয়। কোরআন সুন্নাহর আলোকে সব কিছুর বিচার করাই নিয়ম। এই নীতি সর্বকালের জন্য।

প্রশ্ন- ১৮ ও ১৯ঃ "কোন বিপদ বা রোগ থেকে মুক্তির জন্য হাতে সূতা তাগা ইত্যাদি বাঁধা শির্ক ও বিদ্‌আত" মাসিক মদিনার মার্চ সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইবনে সামছের ১৮ নং উক্ত দাবী কতটুকু সঠিক? সে ১৯ নম্বরে পৃথক করে আরো লিখেছে- *"কোরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ তুমার বাধা কারো কারো মতে জায়েয হলেও ইবনে মাসউদ (রাঃ), কাতাদাহ, শা'বী, সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতে তা মাকরূহ্। বর্তমানে ঈমানের দুর্বলতার যুগে এটিকে হারাম হিসেবেই নেয়া উচিৎ। কারণ এতে আল্লাহর উপর থেকে ভরসা উঠে গিয়ে তাবিজ তুমারের উপর গিয়ে পড়ে। আর তখন তা হবে শির্ক। তাছাড়া তাবিজ বানিয়ে শরীরে ঝুলিয়ে রাখার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়নি"।* ইবনে সামছের এই দাবী কতটুকু সত্য?

ফতোয়া ঃ ইবনে সামছ দাবীর সাথে দলীল পেশ করলে তা খণ্ডন করা যেতো।

সে শুধু যুক্তি দেখিয়েছে। যুক্তি দেখিয়ে কোন মাছআলা হয়না। শিরক বিদআত বলতে হলে শক্ত দলীল পেশ করতে হয়। সে কোনটাই করেনি- বরং কিছু গাজাখুরী কথা বলেছে। ১৮ ও ১৯ নম্বরে বর্ণিত তার দাবীগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিপদ ও রোগ মুক্তির জন্য আলেমগণ সুতা পড়া, তাগা পড়া অথবা তাবিজ তুমার লিখে হাতে বা গলায় ধারণ করার জন্য দিয়ে থাকেন। এগুলোকে সে শিরক বলেছে- অথচ কাফেরদের তৈরী ঔষধ সেবন ও অন্যান্য মালিশ জাতীয় ঔষধ সে নিজেই ব্যবহার করছে। বুঝা গেল- সে ইসলাম বিদ্বেষী।

এবার আসুন! তাবিজ তুমার, সূতা তাগা বা ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে ইসলাম কী বলে- তা পরীক্ষা করে দেখা যাকঃ

<u>১নং দলীল ঃ</u> আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

-অর্থাৎ "আমি কোরআন মজিদের কিছু অংশ এমন নাযিল করেছি- যা যাহেরী-বাতেনী রোগের জন্য ঔষধ বা শেফা স্বরূপ এবং মোমেনদের জন্য রহমত স্বরূপ"। (সূরা বনী ইসরাঈল)

<u>২নং দলীল ঃ</u> নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ لَّمْ يَشْفِ بِالْقُرْاٰنِ فَلَا شَفَاهُ اللّٰهُ -

-অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোরআন মজিদের দ্বারা রোগমুক্ত হতে পারেনি- তার জন্য আল্লাহ্ যেন কোন শেফা মঞ্জুর না করেন"। (আল-হাদীস)

<u>৩নং দলীল ঃ</u> নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও এরশাদ করেন-

اَلْفَاتِحَةُ شِفَاءٌ لِّكُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ-

অর্থাৎ "সূরা ফাতিহা মৃত্যু ব্যতিত সব রোগের ঔষধ"। (তাফসীরে কাশশাফ)

<u>৪নং দলীল ঃ</u> হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ- আমি একদিন এক স্বর্পদংশিত অর্ধমৃত রোগীকে সুরা ফাতিহা পাঠ করে ফুঁ দিয়ে রোগমুক্ত করি। এতে তার পিতা খুশী হয়ে আমাকে একপাল ছাগল দান করেন। আমি তা নিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- রান্না করে আমাকে কিছু গোশত দিও।" (আল-হাদীস)

উপরোক্ত ৪টি দলীল প্রমাণ করে- কোরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা বা তাবিজ দেয়া জায়েয এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে সম্মতি দিয়েছেন।

৫নং দলীল ঃ মুসলিম শরীফে হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِيْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ - فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِيْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ اَعْرِضُوْا عَلَىَّ رُقَاكُمْ-لاَ بَأْسَ بِالرُّقٰى اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থাৎ- হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমরা জাহেলিয়াত যুগে (দেবদেবীর নামে) ঝাড়ফুঁক করতাম। মুসলমান হওয়ার পর আমরা আরয করলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি ঝাড়ফুঁক ব্যাপারে কি বলেন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- তোমাদের ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র আমার কাছে পেশ করো। হাঁ, যদি তাতে শিরকের বিষয় না থাকে- তাহলে ঝাড়ফুঁকে কোন দোষ নেই" (মুসলিম শরীফ)। -এতে বুঝা গেল- শিরকবিহীন দোয়া অর্থাৎ আল্লাহ-রাসুলের কালাম বা নামের দোয়া দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা সম্পূর্ণ জায়েয।

৬ষ্ঠ দলীল ঃ "যাদুল মাআদ" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- তাবিজ তুমার ধারণ করা জায়েয কিনা- এ প্রসঙ্গে ইবনে হিব্বান নামক হাদীস বিশারদ হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন। হযরত জাফর সাদিক (রাঃ) বললেনঃ "যদি আল্লাহর কালাম হয় অথবা রাসুলুল্লাহর হাদীস হয়- তাহলে ধারণ করো এবং ঐ তাবিজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে শেফা প্রার্থনা করো"।

৭নং দলীল ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন "আমি আমার পিতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে হৃদকম্প রোগী ও জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তাবিজ তুমার লিখতে দেখেছি"। (আদিল্লাতু আহলিছ সুন্নাহ ও আন্যান্য গ্রন্থ)

-লিখিত তাবিজ তুমার অথবা পড়া সুতা বা তাগা বাঁধা উক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি- অনেকে দূর্বা ঘাসের আংটি বানিয়ে তাতে ফুঁক দিয়ে

জ্বরের রোগীকে হাতে পরিয়ে দিলে জ্বর ভাল হয়ে যায়। ইবনে সামছ মূলতঃ সৌদী ওহাবী সরকারের সমর্থক। তারা তাবিজ তুমার, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিকে সরাসরি শির্ক মনে করে- অথচ রোগ হলে তারাই কোরআনের আশ্রয় না নিয়ে চলে যায় আমেরিকা- লন্ডনে। সেখানে কাফেরদের দ্বারা চিকিৎসা করায়। ওহাবী-নেতা মৌলভী আশ্রাফ আলী থানবী নিজেই তাবিজের কিতাব লিখেছেন। এখন ওহাবীরাই বেশী তাবিজতি করে। যেমন- হাফেজজী ও তার ছেলে।

সূতা ও তাগা উল্লেখ করে ইবনে সামছ সম্ভবতঃ আজমীর শরীফের তাবারুক সূতার দিকে ইঙ্গিত করেছে। সে জানেনা- নবীজীর ব্যবহৃত রুমাল ধুয়ে উক্ত পানি পান করিয়েছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)। মদিনা শরীফের "খাকে শেফা" পানিতে গুলে পান করলে জ্বর ভাল হয়ে যায় বলে হাদীসে প্রমাণ।

তবে, হাদীস শরীফে এও উল্লেখ আছে- مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ– অর্থাৎ "যে ব্যক্তি (কুফরী) তাবিজ লটকালো, সে শির্ক করলো"। এই হাদীসের অর্থ হলো- যে তাবিজে জাহেলী যুগের মন্ত্র বা নল- নইছা ইত্যাদি থাকে, সেগুলো ধারণ করলে অবশ্যই শিরক হবে। ইবনে সাম্‌ছ সম্ভবতঃ এই হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বলেছে- সর্বপ্রকার তাবিজই শির্ক।। সে এটা দেখলো- অন্যান্য হাদীস ও কোরআন দেখলোনা কেন- যা ইতি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে? বুঝা গেলো- তার আক্বিদায় গলদ আছে।

প্রশ্ন- ২০ ঃ ইবনে সাম্‌ছ ২০নং দাবী করে বলেছে- *"প্রচলিত কদমবুচিও একটি বিদ্‌আত। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), নবী করিম* সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-*এর কদমবুচি করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।"* -তার একথা সত্য কিনা?

ফতোয়া ঃ ইবনে সামছ একজন মিথ্যুক ও প্রতারক। কদমবুচি স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করেছেন। তিনি সাহাবীগণের কদমবুচি নিজে নিয়েছেন। এক সাহাবী আর এক সাহাবীকেও কদমবুচি করেছেন। এবার দেখুন- দলীল।

<u>১নং দলীল ঃ</u> আবু দাউদ হতে মিশকাত শরীফে 'মুখ লাগিয়ে পদচুম্বন' করা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-

وَعَنْ زِرَاعٍ وَكَانَ فِىْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ–

অর্থাৎ "হযরত যিরা' (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি আবদুল কায়েছ প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন- তিনি বলেন, আমরা (প্রতিনিধিদল) যখন মদিনা শরীফে আগমন করলাম, তখন আমরা আমাদের বাহন হতে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম এবং রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হস্ত মোবারক এবং কদম মোবারক চুম্বন করতে লাগলাম" (আবু দাউদ শরীফ সুত্রে মেশকাত শরীফ বাবুল মোসাফাহা।

সিহাহ সিত্তার অন্যতম কিতাব আবু দাউদ শরীফের অত্র হাদীসে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হলো যে, স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কদমবুছি ও দস্তবুছি গ্রহণ করেছেন এবং সাহাবীগণ কদমবুছি করেছেন মুখ লাগিয়ে। ইবনে সাময় বলেছে- কদমবুছির নাকি কোন প্রমাণ নেই। সে কত বড় মিথ্যুক ও প্রতারক- তা বুঝতে আশা করি পাঠকদের কষ্ট হবে না। এই হাদীসটিকে সে সম্পূর্ণ হজম করে ফেলেছে।

২নং দলীল ঃ আল্লামা নববী (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- "সাহাবীগণ কর্তৃক নবীজীর কদমবুছি দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, "যে কোন আমলধারী বুযুর্গ, শরীফ ও পরহেযগার লোকের হাত ও কদমচুম্বন করা মাকরূহ নয়- বরং মোস্তাহাব" (মিশকাত শরীফের সংশ্লিষ্ট টীকা)।

৩নং দলীল ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর (রাঃ) যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রওয়ানা হন, তখন তাঁর মা হযরত আছমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট বিদায় নিতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবাইর (রাঃ) উপুড় হয়ে মায়ের হাত পা চুমুতে চুমুতে সিক্ত করে দিতে লাগলেন। (মাসিক মদিনা মার্চ ২০০৩ সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

-মা সাহাবী, পুত্রও সাহাবী। পুত্র উপুড় হয়ে মায়ের হাত-পা চুম্বন করলেন। দেখা যাচ্ছে- পদচুম্বন শুধু রাসুলের জন্য খাস নয়- বরং মায়ের পদচুম্বনও সাহাবীর আমল দ্বারাই প্রমাণিত। মাসিক মদিনা একই সংখ্যার ৪৩ পৃষ্ঠায় তা

স্বীকার করে আবার ৪০ পৃষ্ঠায় কদমবুছিকে শির্ক বলেছে। সাহাবীগণ এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কার্যকলাপ কি শির্ক? ইবনে সামছ নবীজীর নামে মিথ্যাচার করে নিজের ঠিকানা যে জাহান্নামে বানিয়ে নিয়েছে- তাতে কি সন্দেহ আছে?

প্রশ্ন- ২১ : ইবনে সাম্ছ ২১ নং দাবী করেছে *"বিয়ের আগে বর কনের গায়ে হলুদ দেবার প্রচলিত প্রথা ইসলামী শরিয়তসম্মত নয়"*। -তার একথার যথার্থতা কতটুকু?

ফতোয়া : গায়ে হলুদ দেয়া বাংলাদেশের প্রথা। কোন দেশের প্রথা বা রেওয়াজ যদি শরীয়তের মৌলিক নীতির পরিপন্থী না হয়- তাহলে নিঃসন্দেহে জায়েয। কেননা, শরিয়ত নির্দিষ্ট করে কোন জিনিসকে হারাম না করা পর্যন্ত উহা মোবাহ্ বলে গণ্য হয়। বিয়ের আগে বর-কনের গায়ে হলুদ দেয়ার প্রচলিত প্রথাটিও তদ্রুপ। তবে, গায়ে হলুদ দেয়ার অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধী কোন কাজ হলে ঐ কাজটি শুধু নাজায়েয হবে- মূল প্রথাটি নাজায়েয হবেনা। যেমন- বিবাহ শাদীর অনুষ্ঠানে শরিয়ত বিরোধী কোন কাজ হলে বিবাহ নাজায়েয হবেনা- শুধু ঐ কাজগুলি নাজায়েয হবে। মাযার যিয়ারতের সময় নারীপুরুষ একত্রিত হলে ঐ কাজটিই শুধু নাজায়েয হবে। কিন্তু মূলকাজ যিয়ারত নাজায়েয হবেনা। এই সুক্ষ্ম বিষয়টি বিবেচনা না করে বিবাহে গায়ে হলুদ দেয়ার প্রথাকে নাজায়েয বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক। বিভিন্ন দেশের বিবাহ্-শাদীতে দেশীয় কিছু প্রথা পালন করা হয়। ইবনে সামছ্ কোন ব্যাখ্যা না করে গায়ে হলুদের প্রচলিত প্রথাকে ইসলাম সম্মত নয় বলে দাবী করে অন্যায় করেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নিয়মে গায়ে হলুদ মাখে এবং গোসল করায়। আবার শহরে হলুদ মাখার অনুষ্ঠান অন্য রকমে হয়- যা আপত্তিজনক। তাই বলে সব অনুষ্ঠানকে গয়রহ নাজায়েয বলা অনুচিত। হানাফী মাযহাবে উরফ এবং শাফেয়ী মাযহাবে আদতকে বাংলা ভাষায় "প্রথা" বলা হয়। উভয় মাযহাবে ইহা বৈধ বলে গণ্য। দেখুন- শামী মোকদ্দমা। কোন প্রথাকে হারাম বলতে হলে অকাট্য দলীল লাগবে।

প্রশ্ন- ২২ : ইবনে সামছ ২২ নম্বরে বলেছে- *"মৃত ব্যক্তির জন্য চল্লিশা ইত্যাদি করা বিদ্আত"*। -তার দাবী সত্য কিনা?

ফতোয়া : না, ঠিক নয়। চল্লিশা, কুলখানী- ইত্যাদি মূলতঃ ইছালে সাওয়াবেরই অংশ। ইছালে সাওয়াবের কাজ যে কোন সময় করতে পারে। তবে তিন দিনের

মাথায় কুলখানী ও ৪০ দিনের মাথায় চল্লিশা করার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কারণ আছে। মৃত ব্যক্তির জন্য তিনদিন শোক পালন করা শরিয়তে বৈধ। শোক সমাপ্তিতে কবর খননকারী ও দাফনকারীদেরকে খেদমতের শুকরিয়া স্বরূপ খানাপিনা খাওয়ানো এবং সেই সাথে মরহুমের মাগফিরাতের জন্য কুলখানী বা মিলাদ শরীফ পাঠ করা আরও উত্তম। চল্লিশা পালন করার মধ্যে যেসব গুঢ়রহস্য রয়েছে- সেগুলো নিম্নরূপঃ-

(১) চল্লিশ দিনের মাথায় গর্ভের সন্তানের রূপ পরিবর্তন হয়। ১ম চল্লিশদিনে বীর্য মাতৃগর্ভে রক্ত পিণ্ডে রূপান্তরিত হয়। ২য় চল্লিশ দিনে উক্ত রক্তপিণ্ড গোশত ও হাড্ডিতে রূপান্তরিত হয়। ৩য় চল্লিশ দিনের মাথায় গঠিত দেহে রূহের আগমন হয়।

(২) আধ্যাত্মিক জগতে চল্লিশা বা চিল্লা-র অনেক গুরুত্ব রয়েছে। একাধারে চল্লিশ দিন নীরব গোপন সাধনার মাধ্যমে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়। তিন চিল্লায় আত্মা চরম উন্নতি লাভ করে। চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রায় নবীগণই নবুয়তের দায়িত্ব পেয়েছেন। হযরত ইউনুছ আলাইহিস সালাম চল্লিশ দিন মাছের পেটে থেকে মি'রাজ লাভ করেছিলেন। হযরত মুছা আলাইহিস সাল্লাম কুহেতুরে চল্লিশ দিন চিল্লা করে তৌরাত কিতাব লাভ করেন। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়তের দায়িত্ব লাভ করেন। চল্লিশ বৎসরে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণ হয়। তারপর ভাটা পড়ে। মৃত ব্যক্তি কবরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দুনিয়ার আকর্ষন অনুভব করেন। তারপর পরকালের দিকে মনোযোগী হন। তাঁর এই শেষ বিদায়কে স্মরণ করে তাঁর পরকালের মঙ্গলের জন্য কিছু ছাওয়াব পৌঁছানো উত্তম কাজ (জাআল হক- কৃত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী ও ফতোয়ায়ে আজিজী)

মেয়ের শ্বশুরালয় গমনের সময় মা-বাপ যেভাবে মেয়ের সাথে কিছু সামগ্রী দিয়ে দেয়- তদ্রূপ মৃত ব্যক্তির শেষ বিদায়কালেও তাঁকে কিছু ছাওয়াবের সামগ্রী সাথে দেয়ার উদ্দেশ্যে চল্লিশা করা হয়। ইহা কোরআন সুন্নাহর আলোকে উত্তম কাজ। ইবনে সামছ উদ্দেশ্যমূলকভাবে চল্লিশার সাথে 'মৃত ব্যক্তির চল্লিশা', শব্দটি যোগ করেছে- যাতে তাদের (তাবলীগীদের) চিল্লা বা চল্লিশার উপর আঘাত না আসে। আমি জিজ্ঞাসা করি- তারা যে চিল্লা বা চল্লিশা করে বা তিনচিল্লা করে- ইহার দলীল কোথায়? ওহাবীদের চল্লিশা জায়েয- আর সুন্নীদের চল্লিশা না জায়েয?

শাহ ওয়ালি উল্লাহ সাহেবের ইনতিকালের পর তৃতীয় দিনে এতলোকের সমাবেশ হয়েছিল যে, কোরআন খতম ৮১ এবং কলেমা শরীফের খতম ছিল অগনিত (মলফুযাতে শাহ আবদুল আজিজ রহঃ)।

সুতরাং, কুলখানী ও চল্লিশা পালনের শরয়ী দলীল রয়েছে, কিন্তু ইবনে সামছের দাবীর পেছনে কোন প্রামানিক দলীল নেই। নিম্নে শরয়ী দলিল দেখুন।

<u>চল্লিশার দলীল ঃ</u> তাফসীরে সাভী-তে সূরা বাক্বারার ৫১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় চল্লিশা সম্পর্কে একখানা হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَامُ الرِّبَاطِ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا

অর্থ ঃ "খানকাহ্-র নীরব সাধনায় পূর্ণ মুদ্দত হলো চল্লিশ দিন"। চল্লিশার কোন প্রমান নেই বলে ইবনে সামছের দাবী এই হাদীস ও তাফসীরের দ্বারা কচুকাটা হয়ে গেলো। ওলামাগণ এই হাদীসখানা স্বরণে রাখবেন।

প্রশ্ন- ২৩ ঃ মাসিক মদিনা মার্চ সংখ্যা ২০০৩ইং ৪০ পৃষ্ঠায় ইবনে সামছ ২৩ নম্বরে লিখেছে- *"তাযিমী সিজদা বা সম্মানার্থে আল্লাহ্ ব্যতিত নবী, রাসুল, পীর; অলী বা কবর- ইত্যাদিকে সিজদা করা নিষিদ্ধ এবং শির্ক"*। তার দাবী সত্য কিনা?

ফতোয়া ঃ মোটেই সত্য নয়। তাযিমী সিজদা শিরক নয়-বরং কবিরা গুনাহ্। তাযিমী সিজদাকে শির্ক বলা মূর্খতা ও অজ্ঞতা। ইবাদতের নিয়তে সিজদা করা হলো শির্ক। এটা কেউ করেনা। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে তাযিমী সিজদা করার জন্য ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ করেছিলেন। আল্লাহ্ কখনও শির্কের জন্য নির্দেশ করেন না। হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত ইছা (আঃ) পর্যন্ত সর্বযুগে তাযিমী সিজদা বৈধ ছিল- কিন্তু আমাদের শরিয়াতে তাযিমী সিজদাকে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে ওয়াহেদ-এর দ্বারা- কিন্তু শির্ক বলে ঘোষণা করা হয়নি। নবী ও সাহাবীগণ যাকে শির্ক বলেননি, তাকে মনগড়াভাবে শির্ক বলা হারাম এবং হারামীপনা কাজ।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল অথবা হযরত সাআদ ইবনে মাআয (রাঃ) নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একবার সিজদা করে ফেলেছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সাহাবীকে শুধু বারন করে বলেছিলেন-" لَاتَفْعَلْ অর্থাৎ এরূপ কাজ আর করোনা"। (দেখুন আদিল্লাতু আহলিছ ছুন্নাত- কৃত আল্লামা ইউসুফ রেফায়ী- কুয়েত)। যদি ঐ সাহাবীর কাজটি শির্ক হতো- তাহলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয়ই তা

বলতেন। তিনি শুধু لاتفعل বলেছেন। এতে শুধু হারাম প্রমাণিত হয়- শির্ক নয়। ইনদে সাহেব বিনা দলীলে ও বিনা প্রমাণে তাযিমী সিজদাকে শির্ক বলে মারাত্মক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে- যেমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে আশ্রাফ আলী থানবী। তিনি বেহেস্তী জেওর প্রথমখণ্ড ৩৯ পৃষ্ঠায় সব সিজদাকে কুফর ও শির্ক বলে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। তার খন্ডন লিখা হয়েছে আমার 'ইস্‌লাহে বেহেস্তী জেওর'-এ।

এবার শুনুন তাযিমী সিজদার হুকুম আহকাম ও তার ইসলামী সমাধান।

(১) ফতোয়া শামীতে হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর তাযিমী সিজদা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে-

وَ اخْتَلَفُوْا فِيْ سَجُوْدِ الْمَلَائِكَةِ قِيْلَ كَانَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالتَّوَجُّهُ اِلٰى اٰدَمَ تَشْرِيْفًا كَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ - وَ قِيْلَ بَلْ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ وَالْاِكْرَامِ ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (تا تارخانى)- قَالَ فِىْ تَبْيِيْنِ الْمَحَارِمِ وَالصَّحِيْحُ الثَّانِيْ وَلَمْ يَكُنْ عِبَادَةً لَّهٗ بَلْ تَحِيَّةً وَّ اِكْرَامًا وَلِذَا امْتَنَعَ عَنْهُ اِبْلِيْسُ وَكَانَ جَائِزًا فِيْمَا مَضٰى كَمَا فِىْ قِصَّةِ يُوْسُفَ-

অর্থঃ "হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ফিরিস্তাদের সিজদা করার ধরন ও প্রকৃতি নিয়ে তাফসীর বিশারদগনের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন- সিজদা ছিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন কাবার ন্যায়- অর্থাৎ মুখ ছিল তাঁর দিকে। যেমন, আমরা সিজদা করি খোদাকে- কিন্তু মুখ করি কাবার দিকে। কাবার সম্মান ও হযরত আদমের সম্মান এক বরাবর। অন্য একদল মোফাসসিরীন বলেছেন- না, এরূপ নয়- বরং হযরত আদমকেই সিজদা করা হয়েছিল। তবে উদ্দেশ্য ছিল সম্মান ও তাযিম- ইবাদত নয়। শরিয়াতে মোহাম্মদীতে এই তাযিমী সিজদা হারাম ও রহিত হয়ে গেছে একটি হাদীসের মাধ্যমে। তা হলো- "আমি (নবী) যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার জন্য কাউকে নির্দেশ দিতাম,তাহলে

নারীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য"। (তাতারখানী)। "তাব্য়ীনুল মাহারিম" গ্রন্থকার বলেছেন- "উপরোক্ত দুটি মতের মধ্যে দ্বিতীয়টিই বিশুদ্ধ বা সহীহ্"। অর্থাৎ- সিজদা ছিল আদমের সম্মানের উদ্দেশ্যে- ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। ইহাই বিশুদ্ধ মত। এ কারনেই ইবলিছ হযরত আদমকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সিজদা করতে বিরত ছিল। এই তাযিমী সিজদা পূর্বকালে বৈধ ছিল- যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর পিতামাতা ও ১১ ভাইয়েরা সিজদা করেছিলেন"।

-এতে প্রমাণিত হলো- কোন নবী, রাসুল বা পীর ওলীকে তাযিমী সিজদা করা ইসলাম ধর্মে হারাম ও নিষিদ্ধ- কিন্তু শির্ক নয়। সিজদার পরিবর্তে কদমবুছি ও সালাম দেয়া বৈধ এবং উত্তম। যদি তাযিমী সিজদাকে শির্ক বলা হয়, তাহলে একথা বলা হবে- আল্লাহ্ শির্কের হুকুম দাতা এবং ইউসুফ (আঃ) শির্কের স্বীকৃতিদাতা। এটা কখনও হতে পারেনা। হ্যাঁ,কোন কাজ পূর্বে জায়েয থাকলেও পরবর্তীতে তা হারাম হতে পারে। যেমন, হযরত আদম (আঃ)-এর সময় আপন ভাইবোনের বিবাহ বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তা হারাম হয়েছে। হযরত ইছা আলাইহিস সালামের সময় শরাব হালাল ছিল- ইসলামে তা হারাম করা হয়েছে। ইহা মৌলিক বিষয়ের পরিবর্তন নয়- বরং ব্যবহারিক বিষয়ের পরিবর্তন। এই পার্থক্যটি অনেকেই বুঝেন না। ইবনে সাময়ও তাদের একজন।

(২) তাযিমী সিজদা শির্ক নয়- বরং হারাম হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া আলমগীরীতে উল্লেখ আছেঃ-

وَمَنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ اَوْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَكْفُرُ وَلٰكِنْ يَاْثَمُ لِارْتِكَابِهِ الْكَبِيْرَةَ – هُوَ الْمُخْتَارُ–

অর্থাৎ ঃ "কোন ব্যক্তি বাদশাহ্কে (শাসক) তাযিমী সিজদা করলে, কিংবা তার সামনে ভূমি চুম্বন করলে কাফের হবেনা- কিন্তু কবিরা গুনাহ্র কারনে গুনাহ্গার হবে। ইহাই সর্ব সম্মত গৃহীত ফতোয়া"। (ঐ যুগে বাদ্শাহ ছিল রাষ্ট্র প্রধান)

(৩) খাযানাতুর রিওয়ায়াত গ্রন্থে তাযিমী সিজদার বিধান সম্পর্কে আরও পরিষ্কার

তাবে উল্লেখ আছে-

قَالَ الْفَقِيْهُ اَبُوْ جَعْفَرٍ مَنْ قَبَّلَ الْاَرْضَ بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ اَوْ اَمِيْرٍ اَوْ سَجَدَ لَهُ- فَاِنْ كَانَ عَلٰى وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَايَكْفُرُ وَلٰكِنْ يَّكُوْنُ اٰثِمًا مُّرْتَكِبًا لِلْكَبِيْرَةِ-

অর্থাৎ ঃ "ফকিহ্ আবূ জাফর বলেছেন- কোন ব্যক্তি বাদশাহ্ বা আমিরের সম্মুখে ভূমি চুম্বন করলে অথবা তাকে সরাসরি সিজদা করলে- যদি সম্মানের উদ্দেশ্যে তা করে, তাহলে কাফের হবেনা বটে, তবে কবিরা গুনাহে গুনাহ্গার হবে"। (খাযানাতুর রিওয়ায়াত)

(৪) ফতোয়ায়ে শামীতে তাযিমী সিজদা সম্পর্কে আরও একটি ফতোয়া নিম্নরূপ:-

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَذَكَرَ صَدْرُ الشَّهِيْدِ اَنَّهُ لَايَكْفُرُ بِهٰذَا السُّجُوْدِ لِاَنَّهُ يُرِيْدُ بِهِ التَّحِيَّةَ -

অর্থাৎ ঃ "সাদরুস শহীদের বরাতে ইমাম যায়লায়ী বলেছেন- তাযিমী সিজদার দ্বারা কেউ কাফের হয় না। কেননা, সে তাযিম বা সম্মানের সিজদা করেছে- ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়" (ফতোয়ায়ে শামী)।

উক্ত চারখানা দলীল পেশ করা হলো। এতে তাযিমী সিজদা হারাম ও নিষিদ্ধ প্রমানিত হয়েছে- শিরক নয়। কিন্তু আশ্রাফ আলী থানবী ও ইবনে সামছ তাযিমী সিজদাকে শির্ক বলে নিজেদের অজ্ঞতারই প্রমান দিয়েছে। কবিরা গুনাহ্কে কবিরা গুনাহই বলতে হবে- শির্ক নয়। কেননা, শির্কের দ্বারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। আর কবিরা গুনাহ্র দ্বারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়না। দেওবন্দীদের মারাত্মক আক্বিদা হলো খারেজীদের আক্বিদার অনুরূপ! খারিজীরা বিশ্বাস করে- "কবিরা গুনাহ্ দ্বারা বান্দা কাফের ও মুশরিক হয়ে যায়"। এই জন্যই তারা ভ্রান্তদল। দেওবন্দীরা যে খারেজী সম্প্রদায়ভূক্ত- এই ২৩ নং আক্বিদার দ্বারাই তা স্পষ্ট হয়ে গেল। যারা তাদেরকে খারেজী বলবেনা, তারাও ভ্রান্তদল। (বিস্তারিত জানার জন্য আমার লিখিত "ইসলাহে বেহেস্তী জেওর" দেখুন।

প্রশ্ন- ২৪ ঃ ইবনে সামছ ২৪নং দাবীতে বলেছে- *"ইস্‌তিনজা করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা সুন্নাত পরিপন্থী। নবী করিম (দঃ) এ ব্যাপারে সুফীদের মত আজেবাজে কাজ করতেন না। যেমন, পুরুষাঙ্গ ধরে টানাখিচা করা, কাশাকাশি করা, গলা ঝাড়া দেয়া, রশি ধরে হেলাদোলা করা, সিড়িতে উঠানামা করা, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে তুলা ঢোকানো, বারবার পানি ঢালা আর ঘুরাফেরা করা- এ সবকিছুই কল্পনা বিলাসীদের আবিষ্কার"* (যাদুল মা আদ ১ম খন্ড পৃ: ১১২)।

এখন প্রশ্ন হলো- ইবনে সামছের উক্ত হাওয়ালাকৃত কথা সঠিক কিনা?

ফতোয়া ঃ ইস্‌তিনজা বলতে শুধু প্রস্রাব থেকে পাক হওয়া বুঝায়না- বরং পায়খানা থেকেও পাক হওয়াকে বুঝায়। ইবনে সামছ একটি প্রচলিত রীতিকে কটাক্ষ করতে গিয়ে অপরটি ভুলে গেছেন। হাওয়ালা দিয়েছেন যাদুল মাআদ কিতাবের। উক্ত কিতাবের লেখক ইবনে সামছের মত এমন অশালীন ও টিটকারী মূলক উক্তি করেছেন কিনা- ইবারত উল্লেখ করলে বুঝা যেতো। তা না করে শুধু নাম ব্যবহার করে ফায়দা হাসিল করা অবৈধ। সুফীদের কাজকে আজেবাজে ও কল্পনা বিলাস বলা অশালীন কথা। মনে হয় সে নিজে ইসতিনজা করে না। ইস্‌তিনজা করা পাক পবিত্রতার জন্য জরুরী বা ওয়াজিব। পায়খানার ক্ষেত্রে তিন ঢিলা এবং প্রস্রাবের ক্ষেত্রে এক ঢিলা বা কাপড় ব্যবহার করা উত্তম। ইহা হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত। ঢিলা কুলুখের পর পানি ব্যবহার করা অধিক উত্তম। আর যদি পায়খানা তরল হয় ও পায়খানার রাস্তা অতিক্রম করে অন্যত্র লেগে যায়, তবে পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব। ফিকাহ্ গ্রন্থ ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পেশাব পায়খানা থেকে পাক হওয়া ওয়াজিব। চাই ঢিলা বা কাপড় দিয়ে হোক, অথবা পানি দিয়ে হোক- তবে ঢিলা ও কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নাত এবং তিন ঢিলা ব্যবহার করা উত্তম। পানি ব্যবহার করা আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় (সুরা তওবা)। এর চেয়ে বাড়াবাড়ি করা বা অস্বাভাবিকভাবে বাহ্যিক পরহেযগারী করা ঠিক নয়। পেশাবখানা ও পায়খানার ভিতরে গোপনে যদি কেউ একাজ করে, তবে আপত্তিও করা যাবেনা। জনসম্মুখে এসব করা অবশ্যই বেয়াদবী ও অভদ্রতার শামিল। কোন কোন সম্প্রদায়ের লোককে দেখা যায়- তারা একসাথে দুই কাম করে- এক হাতে কুলুখ, আর এক হাতে মিছওয়াক। এটা জঘন্য অপরাধ। ঢিলা কুলুখ ব্যবহার ও বাড়াবাড়িকে

সুফীদের কল্পনা বিলাস বলা মূলতঃ ঐ কাজকে নিরোৎসাহিত করার সামিল। এটা ঠিক নয়। সুফীদের উপর কটাক্ষ করা আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করার শামিল (বুখারী শরীফ)।

ইসতিনজার ফযিলত সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা অতি উন্নতমানের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। হযরত সালমান ফারছী (রাঃ) বর্ণনা করেন- "এক মুশরিক ব্যক্তি আমাকে ঠাট্টা করে বললো- তোমাদের নবী দেখছি প্রস্রাব পায়খানা সম্বন্ধেও শিক্ষা দেন? আমি বললাম- হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে ঐসময় কিব্‌লামুখী হতে নিষেধ করেন, ডানহাতে শৌচ কাজ করতেও নিষেধ করেন এবং তিন ঢিলার কম ব্যবহার করতেও বারন করেন, গোবর ও হাড় দিয়ে ইছতিনজা করতেও নিষেধ করেন"। (মিশকাত)

-অবশ্য হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিন ঢিলাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত হাদীসে এরশাদ করেছেনঃ

وَ مَنْ اِسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ- مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَ مَنْ لَّا فَلَا حَرَجَ رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَ اِبْنُ مَاجَةَ وَ الدَّارِمِىْ-

অর্থঃ "যে ব্যক্তি ঢিলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় ব্যবহার করে। বেজোড় করলে উত্তম হবে। আর যদি না করে তাহলে কোন ক্ষতি নেই" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারামী)।

-উক্ত হাদীস অনুযায়ী হানাফী মাযহাবের ইমামগণ বলেছেন- তিন ঢিলা ওয়াজিব নয়- তবে উত্তম। ইবনে সামছ ইসতিনজার মাছআলা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়।

প্রশ্ন- ২৫ ঃ ইবনে সামছ ২৫ নং দাবীতে বলেছে- *"চুপে চুপে যিকির করা উত্তম। উচ্চৈঃস্বরে যিকির করা বিদ্‌আত। তবে যেসব ক্ষেত্রে উচ্চঃস্বরে যিকির করা নিতান্ত প্রয়োজন, সে সকল ক্ষেত্রে তা বিদ্‌আত নয়। যেমন- আযান, ইকামত, তাকবীরে তাশরীক, ইমামের সাথে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় যাওয়ার সময়ের তাকবীর, সালাতে কোন অসুবিধা ঘটলে মুক্তাদীগণ কর্তৃক তাসবীহ্ পাঠ এবং হজ্জের তালবিয়া পাঠ- ইত্যাদি"* (মাযহারী ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৫৮)।

এখন প্রশ্ন হলো- ইবনে সামছ তাফসীরে মাযহারীর বরাতে যেগুলোকে যিকির বলেছে, সেগুলো কি যিকির- নাকি অন্য নাম? যিকরে জলী কি বিদ্আত? ইমামের পিছনে জোরে তাকবীর বলা কি জায়েয?

ফতোয়া : ইবনে সামছ তাফসীরে মাযহারীর বরাতে যেগুলোকে যিকির বলে দাবী করেছে, সেগুলো মূলতঃ যিকির নয়। এগুলোর অন্য নাম আছে। যেমন- আযান, ইকামত, তাকবীর- ইত্যাদি। এগুলোর নামেই বুঝা যায় যে, যিকির বলতে যা বুঝায়, এগুলো তা নয়। এগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উচ্চঃস্বরেই বলতে হয়। কিন্তু ইমামের সাথে সমস্ত তাকবীরই চুপে চুপে পড়তে হবে। ইবনে সামছ তাফসীরে মাযহারীর দোহাই দিয়ে এখানে এসে ধরা খেয়ে গেল। কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী এমন ভুল কথা বলতে পারেন না। এগুলো নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট। আযান, ইক্বামত ও তাকবীরে তাশরীক উচ্চঃস্বরে বলা বিদআত হওয়ার প্রশ্নই আসেনা। বরং উচ্চঃস্বরে বলাই সুন্নাত।

যে যিকির নিয়ে প্রশ্ন উঠে, সেগুলো হলো নফল যিকির- যা তরিকতের পীর মাশায়েখগন করে থাকেন। যিক্র দুই প্রকার ঃ যথা, যিক্রে জলি ও যিক্রে খফি। ক্বাদেরিয়া ও চিশ্তিয়া তরিকায় প্রথমে যিক্রে জলির উপর তাকিদ করা হয়- যাতে ধ্যান অন্য দিকে না যায়। পরে আস্তে আস্তে যিক্রে খফির তালিম দেওয়া হয়। অন্য দুই তরিকা- নক্সবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়ায় প্রথম হতেই যিক্রে খফির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ইবনে সামছ তো দেখি তরিকতের উপরও হামলা চালিয়েছে। কোথায় তরিকতের ইমাম- আর কোথায় দোযখের কীট ইবনে সাম্ছ! তরিকতের ইমামগণ বলেন- জোরে জোরে যিকির করা উত্তম- আর ইবনে সামছ বলছে বিদ্আত। (নাউযুবিল্লাহ)

এখন শুনুন যিক্রে জলীর দলীল সমূহ-

(১) বোখারী শরীফের একটি অধ্যায় আছে- যার শিরোনাম হচ্ছে-

اَلذِّكْرُ بِالْجَهْرِ كَانَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থাৎ "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই উচ্চঃস্বরে যিকির করার বিধান"।

উক্ত অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- "নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয নামাযের সালাম ফিরিয়ে জোরে জোরে যিকির করতেন। তা শুনে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বুঝতেন যে, জামাত শেষ হয়েছে।" (বোখারী শরীফ)। (তিনি ছিলেন ছোট এবং খালা উম্মুল মোমেনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ)-এর হুজরায় থাকতেন)।

ইবনে সামছ উচ্চঃস্বরের যিকিরকে বিদ্আত বলে কার বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করলেন? তার তালিকায় তো ফরয নামাযের পর এই যিকিরের উল্লেখ নেই। তাফসীর মাযহারীর লেখক হচ্ছেন কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি। তিনি মোজাদ্দেদিয়া তরিকাভুক্ত। অন্য তরিকার প্রতি কটাক্ষ তিনি কিভাবে করতে পারেন? একথা কি ইবনে সামছ জানেন? তরিকত সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকলে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করতেন না। উত্তমের বিপরীত বিদ্আত হয়না। তদুপরি, ইমামের পিছনে মোক্তাদিগণ রুকু ও সিজদার তাকবীর সমূহ উচ্চঃস্বরে পড়ার বিধান হানাফী মাযহাবে নেই। চুপে চুপে পড়তে হয়। ইবনে সামছ তাফসীরে মাযহারীর দোহাই দিয়ে এমন ভুল তথ্য কিভাবে দিলেন?

(২) উচ্চঃস্বরে যিকির আযকারের ফযিলত সম্পর্কে মুসলিম শরীফে আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَايَقْعُدُ قَوْمٌ يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى اِلَّاحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থঃ "রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- কোন কওম বা দল আল্লাহর যিকিরের মাহফিলে বসে সম্মিলিতভাবে যিকির করলে আল্লাহর ফেরেস্তাগন তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হতে থাকে। আর তাদের কথা আল্লাহ তায়ালা আপন ফেরেস্তাদের নিকট গর্বের সাথে আলোচনা করেন" (মুসলিম শরীফ)। সম্মিলিত যিকির করার অর্থই জোরে যিকির করা।

(৩) বোখারী শরীফে উল্লেখ আছেঃ-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللهُ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ - وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِيْ - فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ - وَاِذَا ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُ-

অর্থঃ "রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে কুদ্সী বর্ণনা করে এরশাদ করেন- আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমার সম্পর্কে বান্দার ধারনা অনুযায়ী আমি তার সাথে ব্যবহার করি। যখন সে আমাকে স্মরন করে বা আমার যিকির করে, তখন আমি তার সাথে থাকি- সাহায্য নিয়ে। যখন সে আমাকে একা একা স্মরন করে, তখন আমিও তাকে একাই স্মরন করি। আর যখন সে দলবদ্ধ হয়ে আমার যিকির করে, তখন আমিও ঐ মজলিস হতে উত্তম মজলিসে (ফিরিস্তার মজলিসে) তার কথা স্মরণ করি"। (বোখারী শরীফ- হাদীসে কুদ্সী)।

উক্ত হাদীসে দলবদ্ধ হয়ে যিকির করাকে উত্তম বলা হয়েছে। দলবদ্ধ হয়ে যিকির করার অর্থই হচ্ছে উচ্চঃস্বরে যিকির করা। ঐ সামান্য কথাটুকু বুঝতে ইবনে সামহ্ কেন এত অক্ষম?

(৪) বায়হাকী শরীফের হাদীসঃ

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ حَتّٰى يَقُوْلَ الْمُنَافِقُوْنَ اِنَّكُمْ مُرَاءُوْنَ وَ فِيْ رِوَايَةٍ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ-

অর্থঃ তোমরা অধিকহারে এমনভাবে আল্লাহ্র যিকির করো- যাতে মোনাফিকরা তোমাদের যিকির শুনে মনে করে- "তোমরা লোক দেখানোর জন্য যিকির করছো। অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে- মোনাফিকরা যাতে মনে করে, তোমরা পাগল হয়ে গেছো"।

লোক দেখানো বা পাগল হওয়া তখনই মনে করে- যখন জোরে জোরে যিকির করা হয়। সম্মিলিত যিকির না শুনলে মোনাফিকরা ঐরূপ মন্তব্য করতো কিভাবে? অতএব প্রমাণিত হলো- উচ্চঃস্বরে যিকির করা নবীজীর সুন্নাত।

www.almarsiam.com

(৫) এক রাত্রে রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়ে শুনলেন- হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) চুপে চুপে যিকির করছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন- লোক দেখানোর (রিয়া) ভয়ে এরূপ করছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- বেশ ভাল কাজ করছো। আবার হযরত ওমর (রাঃ)-এর বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন- তিনি জোরে জোরে যিকির করছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন- শয়তান বিতাড়নের উদ্দেশ্যে জোরে যিকির করছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন-খুব ভাল কাজ করছো। আবার হযরত বিলাল (রাঃ)-এর ঘরে গিয়ে দেখলেন- তিনিও জোরে জোরে যিকির করছেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন- গাফেল লোকদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে জোরে যিকির করছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- বেশ ভাল করেছো" (খালেদ বাগদাদীর হাদিকাতুন নাদিয়া)।

বুঝা গেলো- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিকরে জলি ও যিকরে খফি- উভয় যিকির অনুমোদন করেছেন। যিনি রিয়ার ভয় করেন, তার জন্য খফি যিকির উত্তম। যিনি শয়তানকে বিতাড়ন ও বেখবর দিলকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে জলী যিকির করেন, তার জন্য জলী যিকিরই উত্তম। এজন্যই তরিকতপন্থী পীরগণ মুরিদের অবস্থাভেদে জলী অথবা খফী যিকিরের তালিম দিয়ে থাকেন।

অথচ ইবনে সামছ তরিকতপন্থী কাজী সানাউল্লাহ পানিপথির হাওয়ালা দিয়ে যিকরে জলীকে বিদ্‌আত বলে খুবই জঘন্য অপরাধ করেছেন। কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথি হাদীসের খেলাফ কথা বলতে পারেন না।

প্রশ্ন- ২৬ ঃ ইবনে সামছ ২৬ নং দাবীতে বলেছে *"ঈদে মিলাদুন্নবী পালন বিদ্‌আত, কারণ- নবী করিম (দঃ) কখনো তাঁর জন্মদিন পালন করেন নি, তাঁর জীবিত অবস্থায় বা ওফাতের পরে কোন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেঈন, তাবে তাবেঈন (রহঃ) নবী করিম (দঃ)-এর জন্মদিন উদযাপন করেছেন বলে কোন প্রমান পাওয়া যায়নি। বরং এটি খৃষ্টানদের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। উদ্দেশ্য যতই ভাল হোকনা কেন, এটি একটি বিদ্‌আত এবং বর্জনীয়। ঈদে মিলাদুন্নবী পালনে যদি কোন কল্যাণ থাকতো- তবে খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ)-যারা এ উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন,*

তারা তা কখনও বাদ দিতেন না। মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন নবী (দঃ)-এর আদর্শের অন্তর্ভূক্ত নয়"।

এখন প্রশ্ন হলো- সে একবার ১৬ নং দাবীতে বলেছে "মিলাদুন্নবীর কোন প্রমাণ নাকি নবী করিম (দঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাবেঈন, তাবে তাবেঈন থেকে প্রমাণিত নয়। আবার ২৬ নম্বরে এসে একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখছে। এখানে এসে সে ঈদে মিলাদুন্নবীকে খৃষ্টানদের অনুকরণ বলছে। কোনটিরই সে প্রমাণ দেয়নি। তার এই দাবী কি সত্য?

ফতোয়া : ইবনে সামছ মিথ্যুক ও জার্মানের হিটলারের উজির গোয়েবল্‌স-এর অনুসারী। সে মনে করেছে- একটি মিথ্যা কথা বারবার প্রচার করলে তা সত্য হয়ে যাবে। কিন্তু গোয়েবল্‌স-এর মিথ্যা যেমন জনগণের কাছে ধরা পড়েছে, তদ্রুপ ইবনে সামছের মিথ্যাচারিতাও ধরা পড়বে। আমরা সুন্নী বার্তার প্রশ্ন ও উত্তর বিভাগে তার ১৬ নং দাবী মিথ্যা প্রমাণ করে বলেছি- মিলাদুন্নবী স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করেছেন বৎসরে ৫২ দিন, সাহাবায়ে কেরাম পালন করেছেন নিজ নিজ ঘরে। হুযুরের ইনতিকালের পর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রতি বৎসর ১২ ই রবিউল আউয়ালে একটি লাল উট যবাই করে যিয়াফত দিতেন। খোলাফায়ে রাশেদীন মিলাদুন্নবীর ফযিলত বয়ান করেছেন। তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, বুযুর্গানেদ্বীন-সবাই মিলাদুন্নবীর ফযিলত বয়ান করেছেন। মক্কা শরীফের কিতাব আন্‌নেমাতুল কুব্‌রাতে এখন থেকে ৫০০ বৎসর পূর্বে (৯৭৪ হিজরীতে) তা রেকর্ডকৃত রয়েছে। সে কিতাব আমাদের হাতে রয়েছে। এখন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা পুনরায় ঐ কিতাব সমূহের এবারত উদ্ধৃত করছি- যাতে ইবনে সামছের জারিজুরী ফাঁস হয়ে যায়। দেখুনঃ-

(১) আত্‌-তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন নাযির (৬০৪ হিজরীতে) ও আদ্‌ দুররুল মোনাযযম গ্রন্থদ্বয়ে মিলাদুন্নবীর প্রমাণঃ-

৬০৪ হিজরীর লিখিত কিতাব "আত্‌-তানভীর" গ্রন্থে আল্লামা ইবনে দাহ্‌ইয়া (রহঃ) একখানা হাদীসের উল্লেখ করেছেন- যাতে হযরত আমের আনসারী (রাঃ) কর্তৃক মিলাদ মাহফিলের উল্লেখ আছে। হাদীসখানা নিম্নরূপঃ-

عَنْ اَبِى دَرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبْنَائِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَيَقُوْلُ- هٰذَا الْيَوْمُ- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ عَلَيْكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَتُهُ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ (اَلتَّنْوِيْرُ وَ الدُّرُّ الْمُنَظَّمُ)

অর্থঃ "হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদিনাবাসী সাহাবী হযরত আমেরুল আনসারীর গৃহে গমন করে দেখি- তিনি ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করে রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মিলাদ বা বেলাদাত শরীফের ঘটনাবলী বর্ণনা করে শুনাচ্ছেন এবং তালিম দিচ্ছেন, আর বলছেন- আজকেই সেই মহান দিবস (১২ই রবিউল আউয়াল)। হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মিলাদ শরীফ শুনে এরশাদ করলেন- আল্লাহ্ পাক তোমার জন্য অসংখ্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র ফিরিস্তাকুল তোমাদের সবার জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন"। (আল্লামা ইবনে দাহ্ইয়া কৃত আত্-তানভীর ৬০৪ হিজরী এবং আদ্ দুররুল মুনাযযম)।

প্রমাণিত হলো- হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপস্থিতিতেই এই মিলাদুন্নবী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং হুযুরের অনুমোদনও পেয়েছিল। তদুপরি, উক্ত মিলাদুন্নবীর ফযিলতও স্বয়ং নবীজীই বর্ণনা করেছেন।

৬০৪ হিজরীতে লিখিত কিতাব আত্-তানভীর-এ উক্ত রেওয়ায়াতখানা রেকর্ডকৃত হয়েছে। ইবনে সামহু বা তার মুরুব্বী দেওবন্দীরা ৮০০ বৎসর পর শত চেষ্টা করেও এ রেকর্ড মুছে ফেলতে পারবেনা। মিলাদ শরীফ আমলকারীদের জন্য এই দলীলখানাই যথেষ্ট। ইবনে সামহু বেয়াদবী করে উক্ত অনুষ্ঠানকে খৃষ্টানদের অনুকরন বলে নিজের আখেরাত ধ্বংস করেছে। কথায় আছে- শয়তানের গায়ে আগুন লাগে আযানের শব্দে, আর ওহাবীদের গায়ে আগুন লাগে মিলাদ শরীফে। তাই ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) তাঁর এক

না'তিয়া কালামে বলেছেন-

যিক্‌রে মিলাদুন্নবী করতা রহোঙ্গা উম্‌র ভর,
জ্বল্‌তে রহো নজদিয়ো! জ্বল্‌না তোম্‌হারা কাম হায়।

(২) উক্ত কিতাবদ্বয়ে মিলাদ মাহ্‌ফিলের আর একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত আছে-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ بَيْتِهٖ وَ قَائِعَ وِلَادَتِهٖ بِقَوْمٍ- فَيَبْشِرُوْنَ وَ يَحْمَدُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ - اِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ قَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِيْ- (اَلتَّنْوِيْرُ وَالدُّرُّ الْمُنَظَّمُ)

অর্থঃ "হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত- তিনি একদিন নিজগৃহে কিছু লোক একত্রিত করে হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র তাওয়াল্লোদ শরীফ বর্ননা করে আনন্দ উৎসব করছিলেন, আর আল্লাহ্‌র প্রশংসাবলী সহ দরূদ ও সালাম পাঠ করছিলেন। এমন সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ঘটনা দেখে সুসংবাদ দিয়ে বললেন "তোমাদের সবার জন্যে আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে গেলো।" (আত্-তানভীর ও আদ্-দুররুল মোনাযযম)।

-বুঝা গেলো- তাওয়াল্লুদ শরীফের আয়োজন করা এবং লোক জমায়েত করা ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা স্বয়ং নবীজী কর্তৃক প্রশংসিত ও অনুমোদিত। আরও প্রমাণিত হলো যে, মিলাদ মাহ্‌ফিলের দ্বারা হুযুরের শাফাআত নসীব হয়। আরও প্রমাণিত হলো- যারা মিলাদ শরীফ নবীযুগে বা সাহাবাযুগে ছিলনা বলে দাবী করে, তারা মিথ্যুক ও বদ্‌বখ্‌ত।

(৩) ইস্তাম্বুল হতে প্রকাশিত 'আল ঈমান ওয়াল ইসলাম' গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ-

"Hazrat Abdullah Ibn Abbass (RA) Used to sacrifise a red camel on the birth-day of the prophet every year"

অর্থ "হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রতি বৎসর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে হুযুরের জন্ম দিবস উপলক্ষে একটি রক্তরাঙ্গা উট যবেহ্

করে যিয়াফত দিতেন" (Al-IMAN AND AL-ISLAM-ESTAMBUL)

(৪) খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক পবিত্র মিলাদুন্নবী পালনের ফযিলত বর্ণনাঃ

মক্কা শরীফের তৎকালীন মুফতীয়ে আযম আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রহঃ) কর্তৃক ৯৭৪ হিজরীতে লিখিত "আন্ নেমাতুল কোবরা আলাল আলম" গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

فَصْلٌ فِيْ بَيَانِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ : قَالَ اَبُوْبَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَفِيْقِيْ فِى الْجَنَّةِ - وَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَحْيَ الْاِسْلَامَ - وَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ اَنْفَقَ دِرْهَمًا عَلٰى قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاَنَّمَا شَهِدَ غَزْوَةَ بَدْرٍ وَ حُنَيْنٍ - وَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَنْ عَظَّمَ مَوْلِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ سَبَبًا لِقِرَاءَتِهِ لَايَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا بِالْاِيْمَانِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ- (اَلنِّعْمَةُ الْكُبْرٰى عَلَى الْعَالَمِ فِيْ مَوْلِدِ سَيِّدِ وُلْدِ اٰدَمْ)-

অর্থ মিলাদুন্নবী বয়ানের পরিচ্ছেদঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন "যে ব্যক্তি পবিত্র মিলাদুন্নবী পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমাণ খরচ করবে, সে জান্নাতে আমার সাথী হবে"। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন "যে ব্যক্তি তাযিমের সাথে মিলাদুন্নবী মাহফিল করে, সে ইসলামকে পুনর্জীবন দান করে"। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী পাঠ করার জন্য এক দিরহাম পরিমান খরচ করবে, সে যেন জঙ্গে বদর ও জঙ্গে হোনায়নে যোগদান করলো"। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন "যে ব্যক্তি

তাযিমের সাথে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান করবে এবং এর জন্য উদ্যোগী হবে, সে ঈমানের সাথেই দুনিয়া থেকে বিদায় হবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে" (আন্ নেমাতুল কোব্‌রা ৯৭৪ হিজরী)।

প্রিয় পাঠকবর্গ! লক্ষ্য করেছেন- ৯৭৪ হিজরীর লিখিত মক্কা শরীফের কিতাব কি বলছে, আর মাসিক মদিনার প্রবন্ধ লেখক আবদুল্লাহ্ ইবনে সামৃহ কি বলছে? মাসিক মদিনার সম্পাদকের অনুমোদন না পেলে এটা ছাপা হতে পারতোনা। মিলাদ শরীফ পাঠের কথা উপরে উদ্ধৃত বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং চার খলিফা এর ভিন্ন ভিন্ন ফযিলতও বর্ণনা করেছেন। যথা- যারা মিলাদ শরীফে খরচ করবে- তারা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জান্নাতী সাথী হবে, ইসলামকে পুনর্জীবন দানের মর্যাদা পাবে, জঙ্গে বদর ও জঙ্গে হুনায়নের মত সাওয়াব পাবে, সর্বোপরি- মৃত্যুর সময় ঈমান নসীব হবে ও বিনা বিচারে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। (মিলাদুন্নবীর বরকতে মৃত্যুর সময় তওবা নসীব হবে এবং বেগুনাহ্ হয়ে ঈমানের সাথে কবরে যাবে)।

সিরাতুন্নবী নিয়ে যারা পাগল, তারা কোন সাহাবী কর্তৃক এরূপ একটি বর্ণনা পেশ করতে পারবে কি? ইবনে সামছ আরও মিথ্যা দাবী করেছে যে- পরবর্তী তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন যুগে নাকি মিলাদুন্নবীর প্রমাণ নেই। তাই সংক্ষেপে আন্‌নোমতুল কোবরা গ্রন্থ হতে কতিপয় নাম উল্লেখ করা হলো। যাঁরা মিলাদুন্নবীর ফযিলত বর্ণনা করেছেন- তাঁরা হলেন- (১) হযরত হাসান বসরী (২) ইমাম শাফেয়ী (৩) হযরত মারুফ কারখী (৪) ছিররি ছাকাতী (৫) জুনায়দ বাগদাদী (৬) ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (৭) জালালুদ্দনী সুয়ুতি, প্রমুখ।

প্রশ্ন-২৭ ঃ ইবনে সামছ ২৭ নম্বরে সর্বশেষ দাবী করেছে- *"জন্ম দিবস পালন করা ইসলামী শরিয়ত সম্মত নয়- বরং তা ইহুদী নাসারাদেরই একটি প্রথা বিশেষ। কারণ, জন্মদিন প্রথমে চালু করে নাসারারা, ঈসা (আঃ)-এর আকাশে উঠার প্রায় তিনশ বছর পরে। এটা যদি ইসলাম সম্মত হতো বা এতে কল্যাণ থাকতো, তবে নবী করিম (দঃ) তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তি থেকে শুরু করে ওফাত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরের জীবনে নিজে তা পালন করতেন, অন্যকে করতে উৎসাহিত করতেন। কারও জন্ম দিন পালন করেছেন বলে ইসলামী ইতিহাসে কোন প্রমাণ নেই"।*

এখন প্রশ্ন হলো- আমরা তো শুনেছি জন্ম দিবস পালন করা উত্তম। এতে

আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। অথচ ইবনে সামছের কথা শুনে মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হলো। আসলে ব্যাপারটা কি? বুঝিয়ে বলুন!

ফতোয়া : ইবনে সামছ একটি তোতাপাখীর ন্যায়। মনিবের শিখানো বুলি আওড়ানো তার একমাত্র কাজ। সে নিজেও বুঝেনা- কি আওড়াচ্ছে। ইবনে সামছ মুরুব্বীদের শিখানো বুলি আওড়াচ্ছে। আমরা বারবার প্রমাণ করেছি- জন্ম দিবস পালন করা নবীজীর সুন্নাত। নাসারা ইসায়ীদের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাদের জন্ম দিবস এক রকম এবং মুসলমানদের জন্মদিবস আরেক রকম। ইবনে সামছ গৌরীপুরে আগুন নিবানোর জন্য চিনামুড়ায় পানি ঢালছে। গৌরীপুরা আর চিনামুড়ার মধ্যে যেমন কোন সম্পর্ক নেই, তেমনিভাবে ইবনে সামছের দাবী ও উদাহরনের মধ্যে কোন মিল নেই। এখন শুনুন- জন্ম দিবস পালন করার প্রমাণ আছে কিনা?

(১) মুসলিম শরীফে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম দিবস পালনের প্রমাণ-

عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ اُنْزِلَ عَلَيَّ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

অর্থঃ- হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি সোমবারে কেন নফল রোযা রাখেন- সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- "যেহেতু আমি সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেছি এবং সোমবারেই আমার উপর কোরআনের প্রথম ৫ আয়াত নাযিল হয়েছে" (মুসলিম শরীফ)।

উক্ত হাদীসে প্রমাণিত হলো- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি সোমবারে নফল রোযার মাধ্যমে জন্মদিবস পালন করতেন এবং নুযুলে কোরআন উপলক্ষ্যেও ঐ রোযা রাখতেন। এভাবে বৎসরে ৫২ দিন মিলাদুন্নবী দিবস- তথা জন্ম দিবস পালন করতেন।

ইবনে সামছ মিথ্যাচার করে বলেছে- ইসলামের ইতিহাসে নাকি এর কোন প্রমাণ নেই। আমরা বলবো- ইতিহাসে নয়- খোদ হাদীস শরীফেই প্রমাণ আছে। একটু

চোখ খুলে দেখুন। দেওবন্দীদের মত অন্ধ হবেন না। দেওবন্দের সিলেবাসে ইসলামের ইতিহাসই নেই- জানবে কোত্থেকে?

(২) আল্লাহ্ পাক নেয়ামতের শুকরিয়া এভাবে আদায়ের হুকুম করেছেন-

وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ - (سُوْرَةُ وَالضُّحٰى)

অর্থঃ "হে প্রিয় হাবীব! আপনার প্রভুর নেয়ামতের আলোচনা করুন ও শুকরিয়া আদায় করুন"। সূরা দোহা)।

তাফসীরে সাভীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

وَ التَّحَدُّثُ بِالنِّعْمَةِ جَائِزٌ لِغَيْرِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ اِذَاقَصُدَ بِهِ الشُّكْرُ وَاَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ غَيْرُهُ - قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : اِذَا عَمِلْتَ خَيْرًا فَحَدِّثْ بِهِ اِخْوَانَكَ لِيَقْتَدُوْا بِكَ-

অর্থাৎ ঃ আয়াতখানার শানে নুযুল খাস হলেও হুকুম বা বিধান সকলের জন্য আম। তাই আল্লাহ্র নেয়ামত প্রাপ্তি স্বীকার করে তার চর্চা করা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যদের বেলায়ও জায়েয- যদি উদ্দেশ্য হয় শুকরিয়া আদায় করা এবং অন্যরাও যাতে তাকে অনুসরন করতে পারে। হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন "তুমি যদি কোন ভালকাজ করো, তা অন্যকেও জানাও- যাতে তারাও তোমার অনুসরণ করতে পারে এবং উক্ত ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারে"। (তাফসীর সাভী চতুর্থ খন্ড ৪৩৯ পৃষ্ঠা)

মানব সন্তানের জন্ম হচ্ছে খোদায়ী নেয়ামত। সুতরাং, তার শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে তা পালন করা কোরআনের দ্বারাই প্রমাণিত।

প্রশ্ন- ২৮ ঃ দৈনিক সংগ্রাম ৬-১২-১৯৯৭ ইং তারিখে প্রকাশিত বাইতুল মোকাররমের খতীব ওবাইদুল হক সাহেব বলেছেন- *"যারা শুধুমাত্র শবে-বরাত উপলক্ষে দিনে রোযা রাখে এবং রাতে নফল ইবাদত এবং আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানাদী পালন করে- তারা এটাকে প্রথা বা একটি রসম রেওয়াজে পরিনত করেছে"।* এছাড়া তিনি বলেন, *"যারা ইসলামকে রসম রিওয়াজ ও প্রথা হিসাবে ব্যবহার করবে, তারা আল্লাহর কাছে কোন প্রকার*

খায়ের, বরকত হাসেল করতে পারবে না" (দৈনিক সংগ্রাম ৬-১২-৯৭ ইং), খতীব সাহেবের এ ধরনের কথা সঠিক কি না?

ফতোয়া : মোটেই সঠিক নয়- কয়েকটি কারনে। (১) তিনি শবে-বরাতের রোযা ও রাতের নফল ইবাদতকে প্রথা বলেছেন। প্রথা অর্থ লোকাচার বা লোকেরা যা প্রচলন করে। কিন্তু শবে বরাতের রোযা ও রাতের ইবাদত তো লোকাচার নয়- বরং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। সুন্নাতকে লোকাচার বা রুসম রেওয়াজ বলা কুফরী তুল্য এবং নবীর শানে এহানত বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। একজন আলেম হয়ে তিনি কিভাবে এমন জাহেলী কথা বললেন- ভাবতে অবাক লাগে। (২) তিনি আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠানাদীর কোন ব্যাখ্যা দেননি- তাই তার কথা বাতিল। মুসলমানগণ বুযুর্গানেদ্বীনের প্রবর্তিত নিয়মাবলী পালন করেন মাত্র- মনগড়া কিছু করেন না। এটাকে রুসম রেওয়াজ বলে উড়িয়ে দেয়া ধৃষ্টতার শামিল। বুযুর্গানেদ্বীনের প্রবর্তিত নিয়ম কানুন বা রেওয়ায যদি কোরআন সুন্নাহর আলোকে হয়, তাহলে ডবল সাওয়াব পাবে প্রবর্তক- (হাদীস) (৩) তিনি আরও বলেছেন- "যারা ইসলামকে রসম রিওয়াজ ও প্রথা হিসাবে ব্যবহার করবে, তারা কোন খায়র বরকত পাবেনা"। তাঁর এই কথা সম্পূর্ণ মনগড়া। তিনি কি জানেন না- নামাযের পাঞ্জেগানা জামাত, শুক্রবারের জুমা, দুই ঈদ ও হজ্ব- সবই তো ইসলামী অনুষ্ঠান। তা হলে তার কথামত সবই ছেড়ে দিতে হবে এবং এগুলোতে কোন খায়র ও বরকত পাবে না। নাউযুবিল্লাহ। বোখারী শরীফে আছে-

اَحَبُّ الْاَعْمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاَقْوَمُهَا-

অর্থাৎ- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- যে আমল সদাসর্বদা ও নিয়মিত আদায় করা হয়- উহাই আল্লাহর নিকট প্রিয়তম আমল"। চাই উহা নফলই হোকনা কেন।

বুঝা গেল- শবে বরাতের রোযা ও রাতের এবাদত এবং আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠাদী নিয়মিত আমল করাই আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল। এমন উত্তম আমলকে খতীব সাহেব খয়ের বরকত বিহীন বলে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ও ওহাবী প্রেমেরই প্রমাণ দিয়েছেন। কোন হক্কানী আলেম এমন মনগড়া কথা বলতে পারে না। তার উচিত ছিল দলীল দিয়ে কথা বলা।

প্রশ্ন- ২৯ : ১৩/০৩/৯৪ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর একটি মন্তব্য ছাপা হয়েছে এভাবে *"পবিত্র শবে-বরাত*

মানুষের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনেনা। শবে-বরাতের কোন গুরুত্ব নেই। শরিয়তে শবে বরাতের কোন জায়গা নেই" (দৈনিক সংবাদ ১৩/০৩/৯৪ ইং) -দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী ও খতীব ওবাইদুল হকের উক্ত মন্তব্যগুলো বিজ্ঞাপন আকারে ছাপিয়ে ২০০৩ সালের শবে বরাত উপলক্ষে মসজিদে মসজিদে বিতরন করা হয়েছে। একই বিজ্ঞাপনে সউদী আরবের সরকারী মুফতী আবদুল আযীয আবদুল্লাহ বিন বায-এর উক্তিও ছাপা হয়েছে। সে বলেছে- "বর্তমানে প্রচলিত বিদআত সমূহের মধ্যে একটি বিদআত হচ্ছে শবে-বরাত পালন করা এবং এদিনে সিয়ামরত থাকা (সুত্র : সাপ্তাহিক আরাফাত ৩১ বর্ষ ৩০ তম সংখ্যা)। তাদের কথার কোন ভিত্তি আছে কি না?

ফতোয়া : না, তাদের কথার কোন ভিত্তি নেই। আপনারা নিজেরাই তো দেখতে পাচ্ছেন- তাদের কথায় কোন হাদীস বা কোন কিতাবের উল্লেখ নেই। যদি থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই উল্লেখ করতো। সারা পৃথিবীময় শবে-বরাত পালন করা হচ্ছে। এতেই প্রমানিত হয় যে, নিশ্চয়ই শবে-বরাত পালনের মজবুত ভিত্তি রয়েছে। ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী শরীফের হাদীস সুন্নী বার্তার ৫২ নং বুলেটীনে উল্লেখ করা হয়েছে পবিত্র শবে বরাত পালন সম্পর্কে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পুনরায় উল্লেখ করছি-

(১) ইবনে মাজাহ্ রেওয়ায়াত করেন-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَاكَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَزَّوَجَلَّ يَنْزِلُ فِيْهَا بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلَا مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهُ اَلَامُبْتَلًى فَاُعَافِيَهُ اَلَامُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَهُ اَلَاكَذَا اَلَاكَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ

অর্থ- হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যখন শাবানের মধ্যবর্তী রাত্রির (শবে বরাতের) আগমন হয়- তখন তোমরা ঐ রাত্রিতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করো এবং দিনের বেলায় রোযা রাখো। কেননা, ঐ রাত্রে সূর্যাস্তের

সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার আকাশে আপন তাজাল্লী নাযিল করে ঘোষণা করতে থাকেন- কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো। কোন রোগগ্রস্থ ব্যক্তি আছে কি ? আমি তাকে আরোগ্য দান করবো। কোন রিযিকপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে রিযিক দেবো। অমুক অমুক প্রার্থী আছে কি? আমি তার প্রার্থনা কবুল করবো। এভাবে ফজর পর্য্যন্ত ঘোষণা দিতে থাকেন" (ইবনে মাজাহ্)।

(২) বায়হাকী শরীফের রেওয়ায়াত-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَاكَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مُنَادٍ يُنَادِيْ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاُعْطِيَهُ فَلَا يَسْئَلُ اَحَدٌ اِلَّا اُعْطِىَ اِلَّا زَانِيَةً بِفَرْجِهَا اَوْمُشْرِكًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ-

অর্থঃ হযরত ওসমান ইবনে আবুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যখন শাবানের মধ্যরাত্রের (শবে-বরাত) আগমন ঘটে, তখন প্রথম আকাশে একজন ঘোষণাকারী ফিরিস্তা ঘোষণা করতে থাকে- কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? তাকে ক্ষমা করা হবে। কোন কিছুর প্রার্থী আছে কি? তার প্রার্থণা মোতাবেক দেয়া হবে। এমনিভাবে যে কেউ প্রার্থনা করবে, তাকেই দেয়া হবে- কিন্তু যিনাকারী ও মুশরিককে দেয়া হবেনা" (বায়হাকী শরীফ)।

উল্লেখ্য যে, ইবনে মাজাহ্ সিহাহ্ সিত্তার একখানা কিতাব এবং বায়হাকী শরীফও নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং শবে-বরাতের উক্ত ফযিলত বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল্লাহ বিন বায ও দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী উক্ত হাদীসকে অস্বীকার করে বলেছে- শবে-বরাত বলতে কিছুই নেই। কতবড় জাহেল হলে এমন কথা বলতে পারে- তা সহজেই অনুমেয়। মনে হয়- তারা ইবনে মাজাহ্ ও বায়হাকী শরীফ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। তারা দাজজাল সমতুল্য। মানুষকে মিথ্যা ধোকা দেয়াই তাদের কাজ।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর কথায় হাসি পায়। সে একবার বলে- "পবিত্র শবে বরাত", আবার বলে- "এতে কোন কল্যাণ নেই"। জিজ্ঞাসা করি- যাহা পবিত্র, তাতে তো কল্যাণ থাকারই কথা। তিনি একথা বল্ছেন কোন কিতাব দেখে? নাকি মনগড়া কিতাব? তিনি পুনরায় বেহায়ার মত বলছেন- "শবে-বরাতের কোন গুরুত্ব নেই", "শরীয়তে শবে-বরাতের কোন জায়গা নেই"। জিজ্ঞাসা করি- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন গুরুত্ব আছে এবং শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শবে-বরাত। তাহলে সাঈদী কি নবী বিরোধী কথা বলেন নি? শরিয়তে যদি শবে বরাতের জায়গা না থাকে, তাহলে কি তার নিজ বাড়ীতে আছে? আসলে এরা কি বলতে কি বলে- তা নিজেরাও জানেনা। নজদী টাকার বিনিময়ে তাদের গান না গাইলে যে রিযিক বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এসব আবোল তাবোল বকাবকি!

এসব কথা মক্কা শরীফে দালাল মৌলভীদের মুখে শুনে এসেছি ১৯৮৫ ইং সনে শবে-বরাতের রাত্রিতে। আমি প্রতিবাদ করে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছি। এ পর্য্যায়ে তারা পরাজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে পালিয়ে যায়। সেদিন পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী উমরাকারীরা আমাকে কাঁধে নিয়ে খোদার ঘর তাওয়াফ করেছিলেন। আমার সাথে জমিয়াতুল মোদাররেছীনের সহ-সভাপতি মরহুম মাওলানা আবদুছ ছালাম সাহেব সহ আরো ১১জন প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁরা প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এখন জোটের খুটির জোরে নর্তন কুর্দন করছে। কিন্তু জেনে রাখা ভালো- এক মাঘে শীত যায় না- আরও মাঘ আছে। তখন দেখা যাবে।

প্রশ্ন- ৩০ ঃ দারুস সালাম মিরপুর ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দি গাইড' বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে। *"গাউসুল আযম, মুশকিলকুশা, গরীব নওয়াজ, কাইউমে জামান- এগুলো শিরিকী গন্ধযুক্ত উপাধী। এগুলো একমাত্র আল্লাহকে বলা যেতে পারে- কোন মানুষকে এ উপাধী দেয়া শির্ক"*। উক্ত বইয়ের এই উক্তি সঠিক কি না?

ফতোয়া ঃ উক্ত বইটি বাংলায় লিখিত- কিন্তু নাম রেখেছে ইংরেজীতে The Guide। উক্ত বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত উক্ত মন্তব্য মনগড়া এবং মিস্গাইড। গাউসুল আযম তিনজনের লক্বব- ইমাম হাছান রাদিয়াল্লাহু আন্হু, হযরত আবদুল কাদের জিলানী ও হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত "নুজহাতুল খাতিরিল ফাতির ফী তরজুমাতে ছাইয়েদ

আবদুল কাদের" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- (অনুবাদ)। "হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছয়মাস খেলাফত পরিচালনা করার পর শিয়াদের গাদ্দারীর কারনে এবং উম্মতের বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে আপোষ করে তাঁকে খলিফা বলে স্বীকার করে নেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর এই অবদান ও স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে তাঁকে "গাউছিয়তে উযমা" বা গাউসুল আযমের উপাধীতে ধন্য করেন এবং তাঁরই খান্দানে মধ্যবর্তী যুগে একমাত্র হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ)-কে "গাউসুল আযম" উপাধীতে ভূষিত করেছেন। শেষ জামানায় ইমাম হাসান (রাঃ)-এর বংশে ইমাম মাহদী (আঃ)-কে "গাউসুল আযম" খেতাবে ভূষিত করবেন" (নুজহাতুল খাতির)।

"মুশকিলকুশা" ঃ এই উপাধী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দান করেছেন স্বয়ং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মুশকিলকুশা শব্দটি ফার্সি। এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে- "কাশিফুল কুরুবাত"। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে চারটি উপাধী দান করেছেন। যথা- (১) আছাদুল্লাহ্ (২) আবু তোরাব (৩) মাওলা (৪) কাশিফুল কুরুবাত (দেখুন ওহাবী কিতাব আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া)। নবীজীর প্রদত্ত উপাধীকে অস্বীকার করে শির্ক বলা নবীজীকেই অস্বীকার করার সামিল।

"গরীব নওয়াজ" ঃ হযরত খাজা মুঈনউদ্দিন চিশ্তী (রহঃ)-এর উপাধী। তিনি জীবিত থাকতেই লঙ্গরখানা খুলে গরীব মিছকিনদেরকে দু' বেলা খানা দিতেন। তাই তাঁর উপাধী হয়েছে "গরীব নওয়াজ" বা গরীবের পালনকারী। এখানে শিরিকের কি আছে?

"কাইউমে জমান" ঃ এই উপাধী হচ্ছে হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (রহঃ)-এর। তারপর তিনির খলিফা ও গদীনশীন সাহেবজাদা হযরত খাজা মাসুম বিল্লাহ (রহঃ)-এর উপাধী ছিল "কাইউমে জমান ছানী"। এরপর এই উপাধী ধারন করেছেন 'দি গাইডের' প্রকাশক আবদুল কাহহার, ফুরফুরার আপন পিতা মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দীকী সাহেব। কাহহার সাহেব নিজের পিতার উপাধীকে বলছেন শিরিক। নাউযুবিল্লাহ! তিনি নিজ পিতাকে মুশরিক সাব্যস্ত করে ঐ ঘরে জন্ম নিয়ে কি করে মুসলমান পীর হলেন- তা বুঝে আসেনা।

প্রকৃতপক্ষে অলী-আল্লাহ্গণের বিভিন্ন উপাধী রয়েছে। যেমন- হযরত সুলতান বায়েজীদ বোস্তামীর (রহঃ)-এর উপাধী ছিলো সুলতানুল আরেফীন, হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (রহঃ) উপাধী ছিলো মাহবুবে এলাহী, হযরত আলী

হিজবেরী (রহঃ)-এর উপাধী ছিলো দাতা গঞ্জবখ্শ। এগুলো আল্লাহ্‌র লক্বব নয়- যেমন "দি গাইড" পুস্তক দাবী করেছে। কারণ, আল্লাহ্‌র নাম ও উপাধী সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত। এর বাইরে আল্লাহ্‌র সিফাতি নাম রাখা জায়েয নয়- যেমন গাউসুল আযম, মুশকিল কুশা, গরীব নওয়াজ ও কাইউমে জামান। দি গাইড পুস্তকটির সঠিক নাম রাখা উচিৎ ছিল "দি মিস্‌গাইড"।

<u>শেষ কথা ও উপসংহার</u> **ঃ** আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সামছ মাসিক মদিনার মার্চ সংখ্যা ২০০৩ ইং ৩৯ ও ৪০ পৃষ্ঠায় দলীল বিহীন ২৭টি ভ্রান্ত আক্বিদা প্রচার করে সরলপ্রাণ সুন্নী মুসলমানকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করেছে। আমরা সুন্নীবার্তার ৪৭ হতে ৫০ নং বুলেটিনে ধারাবাহিকভাবে তার ২২টির খন্ডন ও দাঁত ভাঙ্গা প্রামাণিক জবাব দিয়েছি। ৫৩ নং বুলেটীনে খন্ডন করা হয়েছে ৫টি। আশা করি, পাঠকবর্গ উক্ত সংখ্যাগুলো সংগ্রহ করে সংরক্ষন করবেন এবং প্রচার করে ওহাবীদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিবেন। ইবনে সামছ বিনা দলীলে লিখায় তাকে কোন কষ্ট করতে হয়নি। কিন্তু জবাব লিখতে ও খণ্ডন করতে গিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। শুধু সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার খাতিরে- দায়িত্ব মনে করে পরিশ্রম করেছি।

এরপর বাইতুল মোকাররমের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক, জামাতপন্থী মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও ফুরফুরার আবদুল কাহ্‌হার সাহেবগণের তিনটি মন্তব্য সম্পর্কে সুন্নীবার্তা ৫৪ নম্বরে তিনটি ফতোয়া সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকবর্গের আগ্রহ লক্ষ্য করে মোট ত্রিশটি বিষয় কিতাব আকারে ছাপা হলো। নাম রাখা হলো "ফতোয়ায়ে ছালাছীন" বা ত্রিশ ফতোয়া। পাঠকবর্গ এর দ্বারা উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। তথ্যগত কোন সংশোধনী কেউ পেশ করলে সাদরে গৃহীত হয়ে পরবর্তী সংস্করনে ছাপা হবে- ইন্‌শাআল্লাহ্‌! আমীন!!

বিহুরমাতি ছাইয়িদিল মোরছালীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন।

<u>সমাপ্ত</u>

বিনীত

অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল

২১-১২-২০০৩ ইং

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

লেখকের নাম ঃ হাফেয মোঃ আবদুল জলিল আক্বিদা বিশ্বাসে সুন্নী, মাযহাবে হানাফী এবং তরিকায় ক্বাদেরী।

পিতার নাম ঃ মুন্সী আদম আলী মোল্লা। **মাতার নামঃ** মালেকা খাতুন।

জন্ম ঃ ২৬শে ভাদ্র, শনিবার-১৩৪০ বাংলা। চার বোন ও ছয় ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ।

জন্মস্থান ঃ গ্রাম আমিয়াপুর, **পোষ্ট ঃ** পাঠান বাজার, **থানা ঃ** মতলব (উঃ), **জেলা ঃ** চাঁদপুর। দিল্লীর প্রখ্যাত বুযুর্গ ও ফেকাহবিদ আলিম এবং বাদশাহ আলমগীরের ওস্তাদ হযরত মোল্লা জিউন(রহঃ) ছিলেন লেখকের ঊর্ধতন পুরুষ। হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) রচিত ফেকাহর নীতিশাস্ত্র নুরুল আনোয়ার গ্রন্থখানা দুনিয়া ব্যাপী সমাদৃত এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ফাজিল জামাতের পাঠ্যগ্রন্থ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের কারণে ইংরেজ কর্তৃক মুঘল সালতানাতের পতনের পর হযরত মোল্লা জিউন (রহঃ) এর বংশধরগণের একটি শাখা প্রাণভয়ে তৎকালীন ত্রিপুরা বর্তমান কুমিল্লার ময়নামতিতে হিজরত করে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস গড়ে তুলেন। কালক্রমে ঐ বংশই বর্তমান আমিয়াপুর গ্রামে এসে নেছা বিবির সম্পত্তি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকেন। (পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য)।

শিক্ষা দীক্ষা ও কর্মজীবনঃ লেখক প্রথমে মক্তবে কুরআন মজিদ ও কিছু কিতাব শিক্ষা করেন। ৪র্থ শ্রেণী পাস করার পর হিফ্‌য আরম্ভ করেন এবং দু'বছর তিন মাসে ১৯৫৩ ইং হিফ্‌য শেষ করেন। তারপর ১৯৫৫সালে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে দাখিল,আলিম,ফাজিল ও কামিল(হাদীস)১ম বিভাগে বৃত্তিসহ ১৯৫৬ইং ১৯৬৪ইং সালে উত্তীর্ণ হন। তারপর ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রী ও এম,এ, (জেনারেল ইতিহাস) উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগে ষ্টাইপেন্ডসহ পাস করেন ১৯৬৬-১৯৭০ইং সালে। আরবী ও জেনারেল শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৭২সালে কলেজের অধ্যাপনা শুরু করেন। ছাগলনাইয়া কলেজ ও লাকসাম ফয়জুন্নেছা কলেজে ৪ বৎসর ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেন। উচ্চতর শিক্ষার পাশাপাশি জিবীকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহরে ১৯৬৪-৭৮ ইং সামান্য বিরতিসহ হযরত তারেক শাহ্ (রহঃ) দরগাহ মসজিদে ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনার ফাঁকে ১৯৭৩ইং সালে ১বছর অগ্রণী ব্যাংকে প্রবেশনারী অফিসার হিসেবে কাজ করে ইস্তফা দেন। ১৯৭৩ ইং বিসিএস লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হাজীগঞ্জ বড় মসজিদে ১৯৭৫ সালে ছয় মাস ইমাম ও খতীবের দায়িত্ব পালন করে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম চলে যান। চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে ১৯৭৭ইং সালে যোগদান করেন। ১৯৭৮সাল থেকে ১৯৮৭ইং সাল পর্যন্ত ঢাকা মোহাম্মদপুর কাদেরিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭-৯০ইং ৪ বছর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর ইমাম ট্রেনিং প্রজেক্ট ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালনকরে পুনরায় ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মসজিদের খতীব ও ওয়াজ নসিহত এবং আহলে সুন্নাতের নির্বাচিত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বুখারী শরীফ সহ তার লিখিত,অনূদিত ও সম্পাদিত ১৭খানা গ্রন্থ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। মাসিক সুন্নীবার্তা নিয়মিত প্রকাশ করেছেন।

বিদেশ ভ্রমণ ঃ ১৯৮০ ইং সালে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের আজমীর শরীফ হযরত খাজা গরীবনওয়াজ (রহঃ) ও বেরেলী শরীফের আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহঃ) এর মাযার শরীফসহ বহু মাযার জিয়ারত করে ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। ১৯৮২ইং সালে ইরাক সরকারের নিমন্ত্রণে বাগদাদে অনুষ্ঠিত মোতামারে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশ মোদারেছীন প্রতিনিধি দলের সাথে গমন করেন। সেই সাথে পবিত্র হজ্ব ও যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং বাগদাদ শরীফের গাউসুল আযম (রাদিঃ) এর মাযার সহ অসংখ্য নবী ওলীর মাযার শরীফ যিয়ারত করেন। ১৯৮৪ইং ১৯৮৫ইং সালে দু'বার ইরাক সরকারের আহবানে পুনরায় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন ও সেই সাথে যথাক্রমে হজ্ব ও ওমরাহ্ পালন করেন। ১৯৯৯ ইং সালে লন্ডন এবং ২০০৩ সালে সুইডেন, লন্ডন ও দুবাই সফর করেন। বর্তমানে অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি ছুন্নী গবেষণা ও লেখালেখির কাজে ব্যস্ত আছেন। বাংলাদেশে সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহলে সুন্নাতের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকার শাহজাহানপুরে বহুতল বিশিষ্ট (প্রস্তাবিত) গাউসুল আযম জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। শরিয়ত ও তরিকত প্রচারের কেন্দ্ররূপে উক্ত মসজিদ গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯৭ইং ২৪শে নভেম্বর তারিখে বাগদাদ শরীফের বর্তমান গদীনশীন মোতাওয়াল্লী হযরত সাইয়্যেদ আব্দুর রহমান আল জিলানী সাহেব (মাঃজিঃআঃ) তাঁকে লিখিত খেলাফতনামা প্রদান করেছেন। লেখকের নিজ গ্রাম আমিয়াপুরে হযরত বিবি ফাতেমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

তারিখ ঃ নভেম্বর ২০০৩ ইং